আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম

সম্পাদনায়

শেখ হাসিনা

বেবী মওদুদ

আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম ❑ সম্পাদনায়ঃ শেখ হাসিনা ॥ বেবী মওদুদ ❑ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর

ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব
আমি বাঙালী, বাংলা আমার দেশ
বাংলা আমার ভাষা

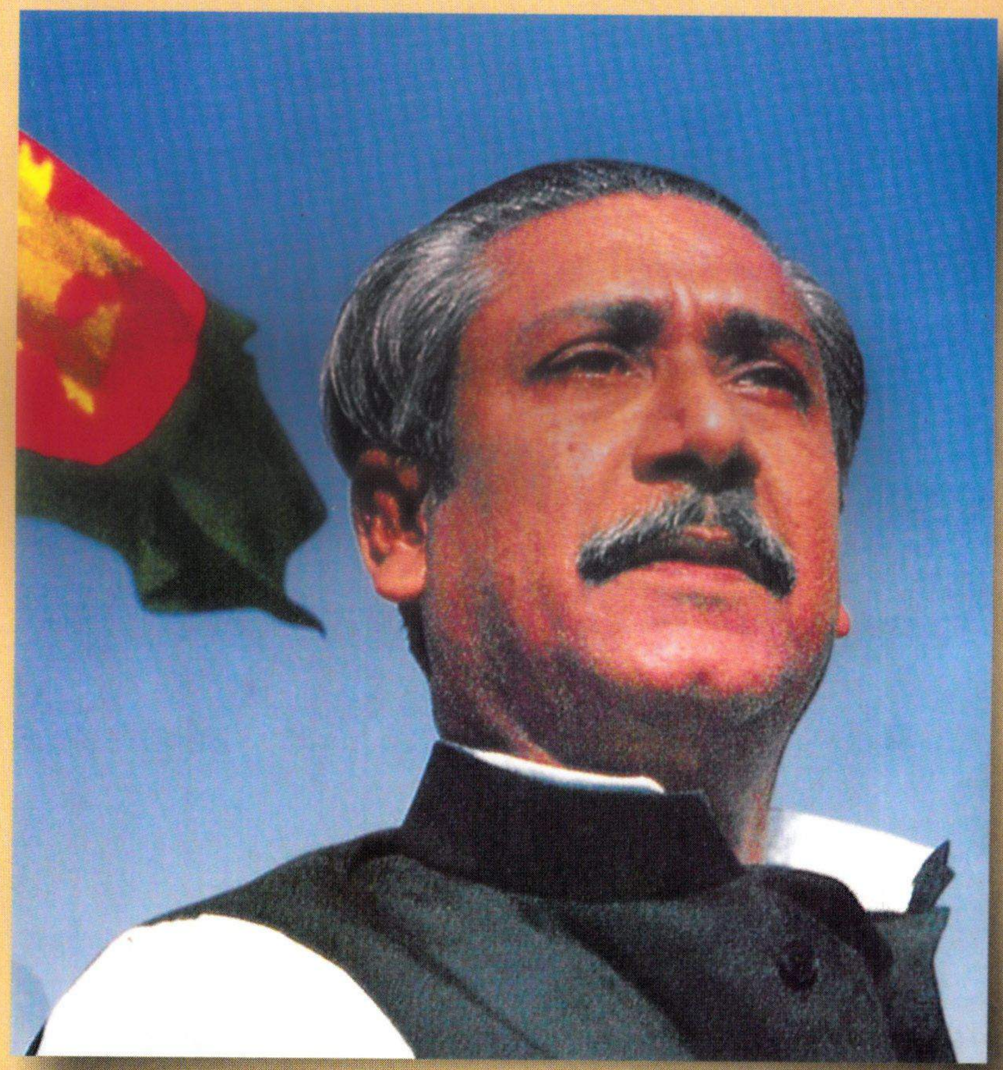

আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম

সম্পাদনায় ঃ শেখ হাসিনা
বেবী মওদুদ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর

যতোকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততোকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয়, হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।

অন্নদা শঙ্কর রায়

প্রকাশনায় ঃ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর
৩২ নং সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা
প্রকাশকাল ঃ ফাল্গুন, ১৪০৩, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ এপ্রিল, ১৯৯৭
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ মাসুক হেলাল
প্রচ্ছদ ছবি ঃ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নিউজ উইক এর সৌজন্যে
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ অনিও কম্পিউটার,
৮ ডি আই টিএক্সটেনশন রোড মতিঝিল, ঢাকা
মুদ্রণ ঃ গ্রাফটোন প্রেস
পুরানা পল্টন, ঢাকা
মুল্য ঃ ৬০ টাকা $ 4

সূ চি প ত্র

৬ দফা ইশতেহার	❑	৭
বাঙালির বাঁচার দাবি	❑	৯
আমি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী	❑	২১
নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও দেশকে সঙ্কটমুক্ত করতে চাই	❑	২৭
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	❑	৪২
স্বাধীনতার ঘোষণা	❑	৪৫
আমি মৃত্যুদন্ডের জন্য অপেক্ষা করছিলাম	❑	৪৬
ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ বাংলা আমার ভাষা	❑	৪৭
বাংলাদেশ-ভারত ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি	❑	৫০
আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম	❑	৫২
বাংলাদেশ শান্তি ও সংগ্রামের প্রতীক	❑	৬২
যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও সাফল্য	❑	৬৯
শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবো	❑	৭৪
বাংলাদেশ এসেছে বাংলাদেশ থাকবে	❑	৮৬

ভূ মি কা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি লালিত স্বপ্ন ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। এই স্বপ্নকেই বাস্তবায়িত করেছিলেন তিনি রাজনৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সংগ্রামে এবং মুক্তিযুদ্ধ করে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম ১৭ মার্চ ১৯২০ সালে, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। একজন আদর্শবাদী বাঙালি হিসাবে তিনি শৈশব থেকে গড়ে ওঠেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এরপর পাকিস্তান আমলে তিনি নেতৃত্ব দিলেন বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনে, যা পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এজন্য তাঁকে দীর্ঘদিন কষ্ট করতে হয়েছে। পাকিস্তানী সামরিক শাসকগোষ্ঠীরা তাঁকে বারবার কারাবন্দী করেছে। রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ফাঁসির মঞ্চে তুলতে চেয়েছে। তাঁর একমাত্র অপরাধ ছিল বাঙালি জাতির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন সংগ্রাম। তিনি চেয়েছিলেন বিশ্ব দরবারে বাঙালি জাতির প্রতিষ্ঠা।

৭মার্চ ১৯৭১ সালে ঐতিহাসিক ভাষণে পাকিস্তানীদের শোষণের-শাসনের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তাঁর সেই আহ্বানে সেদিন সমগ্র জাতি একাত্ম হয়। তিনি স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছিলেন ২৫ মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করেছে, অসহায় মা-বোনকে ধর্ষণ করেছে এবং ঘর-বাড়ি-গ্রাম-মাঠের ফসল পুড়িয়েছে, বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে বুলেট বেয়নেটসহ যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে। কিন্তু বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধারাও গেরিলা যুদ্ধ করেছে, বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করেছে এবং স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড়িয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন ও আদর্শবাদী সংগ্রাম ছিল বাংলাদেশ। এই স্বপ্ন ও সংগ্রামের জন্য তাঁর চিন্তা চেতনা ও ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন বক্তব্যে। এ গ্রন্থে আমরা তাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আজকের প্রজন্মকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শ ও সংগ্রাম নতুনতর চেতনায় উজ্জীবিত করুক এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করুক এটাই আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা।

২৪.১.৯৬

শেখ হাসিনা

বেবী মওদুদ

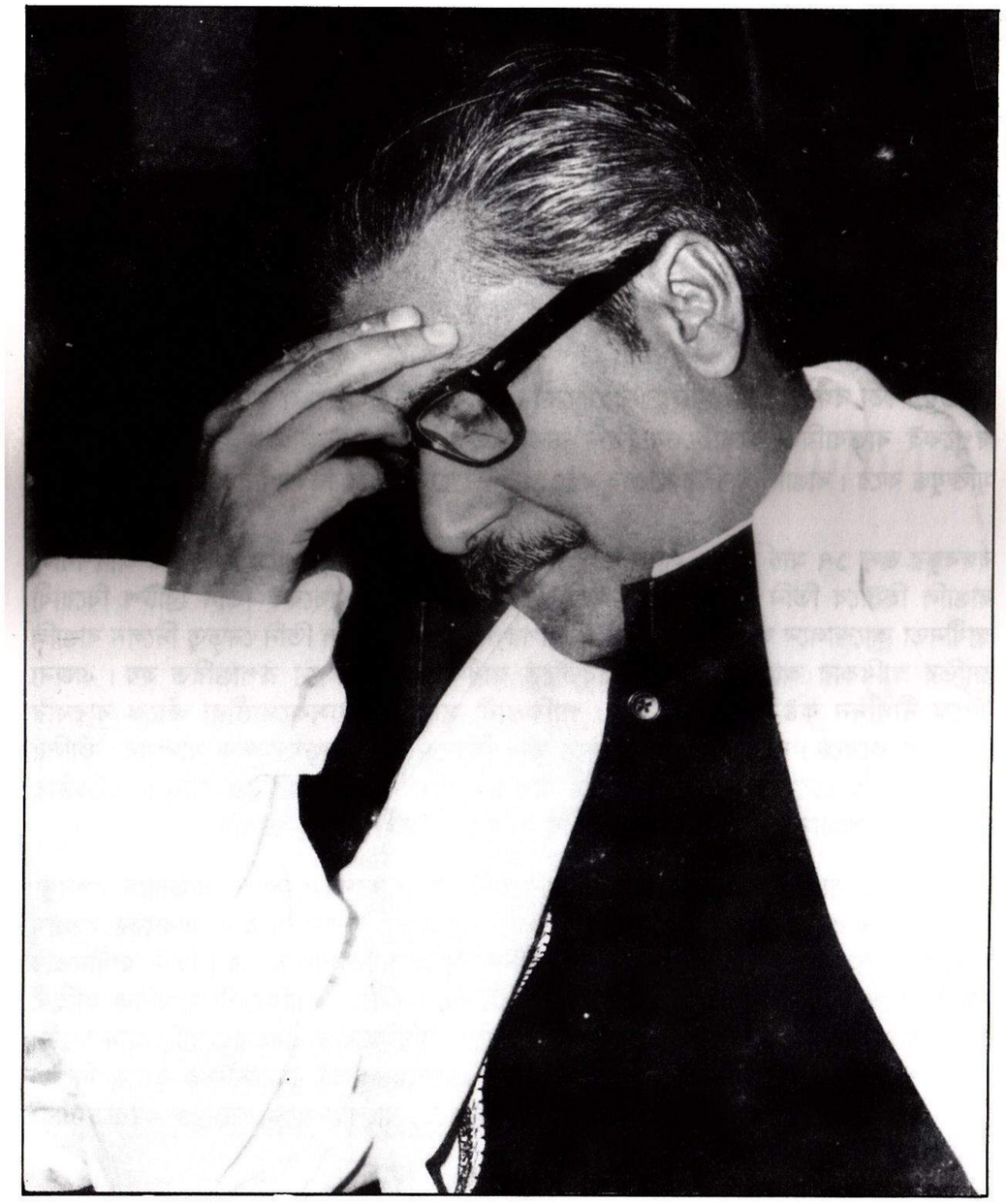

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
জন্ম ঃ ১৭ মার্চ ১৯২০ শাহাদৎ বরণ ঃ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫

৬ দফা ইশ্‌তেহার

৭ জুন ১৯৬৬ সালে ঘোষিত

ভারতের সাথে বিগত সতের দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে আজ নতুনভাবে চিন্তা করে দেখা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে বাস্তব যে সব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রশ্নটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জাতীয় সংহতি অটুট রাখার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকল্পই দেশকে এই অস্বাভাবিক জরুরী অবস্থাতেও চরম বিশৃংখলার হাত হতে রক্ষা করেছে।

এই অবস্থার আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে পাকিস্তানের দুইটি অংশ যাতে ভবিষ্যতে আরও সুসংহত একক রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে পরিগণিত হতে পারে এই সংক্ষিপ্ত ইশ্‌তেহারটির লক্ষ্য তা-ই। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই আমি দেশবাসী জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের আজিকার কর্ণধারদের কাছে নিম্নলিখিত ছয় দফা কর্মসূচী পেশ করছি।

প্রস্তাব-১. শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি ঃ

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারী ধরনের। আইন পরিষদের (Legislatures) ক্ষমতা হবে সার্বভৌম। এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব-২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ঃ

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দু'টি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে- যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব-৩. মুদ্রা বা অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ঃ

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুইটির যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে

(ক) সমগ্র দেশের জন্য দু'টি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

অথবা

(খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবল মাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং রিজার্ভেরও পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব-৪. রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ঃ

ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ-রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলির সবরকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব-৫. বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা ঃ

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মিটাবে।

(ঘ) অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব-৬. আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা ঃ

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

বাঙালির বাঁচার দাবি

৬ দফার ব্যাখ্যা

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরূপে ৬ দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থান্বেষী দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি সনদ একুশ দফা দাবী, যুক্ত-নির্বাচন প্রথার দাবী, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প ব্যয় শিক্ষালাভের দাবী, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী ইত্যাদি সকল প্রকার দাবীর মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবীতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দূরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত, বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি-তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬-দফা দাবী অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬-দফা দাবী আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এঁদের দশটা, গলার সুর এদের শতাধিক। এঁরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকারী দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন (বিরোধী) দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের

জনগণের দুশমনির বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলাকলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এঁদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬ দফা দাবীর তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁরা সকলে অবিলম্বে ৬ দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬ দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরো পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রেই এইসব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১ নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ এক বাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোটও দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবী ছিল অন্যতম প্রধান দাবী। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারী সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখন দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবী করিয়া আমি কোনও নতুন দাবী তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরান দাবীরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলে যাঁরা আঁতকাইয়া উঠেন তাঁরা হয় পাকিস্তান-সংগ্রামে শরীক ছিলেন না, অথচ পূব পাকিস্তানের জনগণের দাবী-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের দালালী করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের যে দাবী করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল, না প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইনসভাই ভাল, এ বিচারভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য সংগতির এই তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাই-এর প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তারা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক।

২ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকী সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিন মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখন্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখন্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখন্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ-পোস্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ না বলিয়া 'স্টেটই বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থবাদী শোষকেরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট অর্থে আমি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ বা 'প্রভিন্স না বলিয়া 'স্টেট বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানী এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে, তবে পূব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩ নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে ঃ

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, একথা বলা চলে না। যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন। আমরা তাদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল

ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া বৃটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিষ্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাংকের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দন্ড প্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দফতর নাই শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিকসমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐ সব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাংক বহু দিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে পূর্ব পাকিস্তান বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান বা সংক্ষেপে 'লাহোর লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শন স্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশায় মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার জন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে।

সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন, সরকারী স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকসহ সমস্ত ব্যাংকের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু'একখানি ব্যাংক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এই সব ব্যাংকের ডিপজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেন-দেনের টাকা

বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণে পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মুলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতিহেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যতা, জনগণের বিশেষতঃ পাটচাষীদের দুর্দশা সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫ নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্পে বাণিজ্যে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মুলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজাভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামুলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কি রূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশংকাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তারা এ সব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁরা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্য্যের দায়িত্ব দেওয়া

না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারী তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট বিজ্ঞানে স্বীকৃত। তারা এ খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অথ দফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দফতর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশ রক্ষা বাহিনী ও পররাষ্ট্র দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকায় হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায় খরচার অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার বাহিনীকেও উন্নতর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থতঃ ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থবিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫ নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছিঃ

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম

পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী রফতানী চলিবে।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মুত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩ নং দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একট নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যে-

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্প-জাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উঠিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এই ভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানী করে আমদানী করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানী করা একই জিনিষের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বন্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্যমূল্য তো দূরের কথা আবাদী খরচাটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নেই। যত দিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনর-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাইবার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরীব পাটচাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানীকে সরকারী আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরদ্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাট চাষীকে পাটের ন্যায্যমূল্য দিতে হইলে, আমদানী-রফতানী সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬ নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবীতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তাতো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই, পি, আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবী একুশ দফার দাবী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজ হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসন কর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করুন। অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌবাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাট অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐ সব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই বোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে-

এক, তারা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬ দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি-স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই, আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না? কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেই অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুণ, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এখন শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থ বিজ্ঞানের কথা- সরকারী আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারী ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে, প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরীব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে ঐ সব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরিব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যে সব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতায় তহমত দিতেছেন সেই সব দাবি আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মত আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনারদের অন্যায়ও হইত না।

তিন, আপনারা ঐ সব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গালি দিতাম না। কারণ, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ও-সব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হকটাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চাই। আপনাদের হক্‌টা আত্মসাৎ করিতে চাই না।

আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে ঃ

(১) প্রথম গণ পরিষদে আমাদের মেম্বার সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশ রক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪ টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বার নির্বাচন করিয়াছিলাম।

(৩) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্র ভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

(৪) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

(৫) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুও ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার, সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবি করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্যসত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশ সমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূণ স্বায়ত্ত শাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকিস্তানীরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়, ছোট বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীর।পূব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সব অধিকার ও চাকুরী গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের পি, আই, ডি, সি, আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি-আই-ডি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যান আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিস্‌প্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইন্‌সাফ বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব

জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয়দফা কর্মসূচীর বিচার করবেন। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয়দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬ দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ দাদার মত মুরুব্বিরাই এঁদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এঁদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়ন-মণি শেরে-বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেলজুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোওয়া, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে সব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচকোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে-কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া পৌঢ়ত্বে পৌঁছাইয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লাহ্র দরগায় শুধু এই দোওয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২। আপনাদের স্নেহ ধন্য খাদেম

শেখ মুজিবুর রহমান।

আমি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় লিখিত জবানবন্দী

স্বাধীনতা পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিকতার পথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদের এবং পরে জাতীয় সভায় সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকন্তু আমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠন করার জন্য আমাকে ইতিমধ্যেই কয়েক বৎসর কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারীতে আমাকে উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিলাভকালে আমার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারী করা হয়- যেমন; ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার মত আমার পিছু লাগিয়া থাকিত।

অতপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারীর প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন আমাকেও জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স

বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধী দল এইসময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাকে মনোনয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারী কর্তৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে। ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ সকল বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্ব শান্তিতে আস্থাবান, আমরা বিশ্বাস করি যে সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত। ১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান- ছয়দফা কর্মসূচী উপস্থাপন করি। ছয়দফা কর্মসূচীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান-উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হইয়াছে। অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয়দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয়দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দ ও সরকারী প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায় 'গৃহ যুদ্ধ ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের

অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানাবলে এইবারের মত প্রথম গ্রেফতার করে।

আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনবলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা সাতটায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই, আটটায় পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানাবলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পরদিন সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন প্রদান করেন কিন্তু আমি মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারী পরোয়ানা ময়মনসিংহ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই রাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীন ময়মনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একইভাবে ময়মনসিংহে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃত হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরোক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেফতারী প্রহসন ও হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে-সম্ভবতঃ আটই মে আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুলস্ব-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মুশতাক আহম্মদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহম্মদ চৌধুরী প্রমুখ। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম এন এ, প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মুসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ এডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপটেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এম এন এ জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন,

নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহীউদ্দিন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ, এডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন আহমদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব রশীদ মোশারফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নূরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্র নেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষা বিধির ৩২ ধারার (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র-পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বারস অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি বলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোক গ্রেফতার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম খান প্রায়শঃই তাহার লোকজন এবং সরকারী কর্মচারী সমক্ষে উন্মুক্তভাবে বলিয়া থাকেন যে যতদিন তিনি গদিতে আসীন থাকিবেন ততদিন শেখ মুজিবকে শৃংখলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন। আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারালয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের ১৭/১৮ তারিখ রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহিঃজগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না, বিশ্ব

হইতে সকল যোগাযোগ বিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাসকাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রকাশ করিতে হয় ততই উত্তম।

এই বিচারকার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন আমি প্রথম এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাহাকে আমার অন্যতম কৌঁসুলী নিয়োগ করি। কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য। এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এল এস সুলতান উদ্দিন আহাম্মদ, কামালউদ্দিন আহাম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্মচারীদের কখনও দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান- এই তিনজন সি এস পি অফিসারদের আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারী কার্যসম্পাদনকালে তাহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাহারাও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু আমি তাহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোন ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনদিন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে গমনকরি নাই কিংবা আমার অথবা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসভবনে কোন সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোন ব্যক্তির সহিত কোন আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজুদ্দীনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তি কোনদিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দেই নাই। আমি কখনও ডাঃ সাইদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র করিতে বলি নাই। তাহারা চট্টগ্রামে আমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত সাধারণ কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রহিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী, এম এন এ ও এমপিএ। বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের দশ জন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ, প্রাক্তন এম এন এ, এম পি এ ও অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাহাদের কাহারও নিকট কোন প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে আমি একজন

সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এল এম এফ ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোন সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্য ডাঃ সাঈদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডাঃ সাঈদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল-দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায় বিচার চাহিয়াছিলাম-ছয়দফা কর্মসূচীতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গন্ডির ভিতর জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসা বশতঃ মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে- তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে- এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে। একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোন বিভাগ হইতে কোন প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না। এবং এবটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র জাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোন কিছু করি নাই কিংবা কোনদিনও এই উদ্দেশ্যে কোন স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মচারীর সংস্পর্শে কোন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও দেশকে সঙ্কটমুক্ত করতে চাই

১৯৭০ সালের নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর বেতার-টেলিভিশন ভাষণ

আজ থেকে ২৪ বছর আগে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার রঙ্গিন আশায় বুক বেঁধে এমনি করেই একদিন জনগণ ভোট দিয়েছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে, কিন্তু দিন না যেতেই দেখেছেন পাকিস্তানের জন্মলগ্নে জনগণের দেয়া সুস্পষ্ট ম্যাণ্ডেটের প্রতি এদেশের একশ্রেণীর নেতার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সব স্বপ্ন তাদের ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছে। কেবল বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষই নয়, সারাদেশের বারো কোটি মানুষই আজ ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে নিজ দেশে পরবাসী। পরাধীন আমলেও এ চেহারা এদেশের মানুষের ছিল কি-না তা জনগণই তার বিচার করবেন। স্বাধীনতা-উত্তর জীবনে বিগত ২৩টি বছর ধরে সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, শোষণ ও বঞ্চনা এদেশের মানুষকে পোহাতে হয়েছে, তার সাক্ষী কেবল আমি বা আমার দলই নয়, সাক্ষী প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ। তাঁদের সন্তান ছালাম-বরকত বুকের রক্ত ঢেলে রাজপথে যে সংগ্রামী চেতনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছিল, তারই সুত্র ধরে এদেশের আরও শত শত সোনার সন্তানের আত্মদানের পরে হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক কর্মীর অপরিসীম নির্যাতন ভোগের ফলশ্রুতিতে এদেশের মানুষ আজ তাদের অধিকার ফিরে পেতে চলেছে। জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের সৃষ্ট ফসল হিসাবে এইবারই সর্বপ্রথম দেশের আপামর মানুষের মতামত নিয়ে তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব সমাধার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত দুই যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণেরই মতামত নিয়ে পাকিস্তানের বুকে শোষণহীন, ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠার উপযোগী একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যে সুযোগ আজ এসেছে, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার ও নির্ভুল প্রয়োগের উপরই এদেশের আপামর জনসাধারণের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

ষড়যন্ত্রের রাজনীতি

পাকিস্তানের বিগত তেইশ বছরের ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ধারাক্রমে জাতি আজ এক চরম সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সঙ্কট থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য

দেশব্যাপী যে নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে তাকে উপলক্ষ করে প্রতিপক্ষীয় রাজনীতিকরা সেই পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল শোষক সম্প্রদায়ের প্রভুদেরকেই আবার ক্ষমতার আসনে বসাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। একটু তলিয়ে দেখলেই তাদের এ কারসাজি বুঝা কঠিন নয়। গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শোষণ চক্রের এই বাঙালী দালালরা পাকিস্তানের জন্মাবধি নির্বাচন এড়িয়ে জনগণ থেকে নিজেদেরকে সযত্নে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখে, কখনও পশ্চাৎদ্বার দিয়ে, কখনও বা লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সরাসরি গিয়ে কুচক্রী ও কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণস্বার্থের সমাধির উপর নিজেদের ভাগ্যের ইমারত গড়েছেন, আবার আন্দোলন দেখলেই পিঠটান দিয়ে আরাম কেদারায় শুয়ে নতুন কোন সুযোগের প্রতীক্ষায় দিন গুজরান করেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের অপপ্রচারের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের মুরুব্বীদের হয়ে গোপন অভিসন্ধি চরিতার্থ করা । কে না জানে যে, এবারকার নির্বাচনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে জাতীয় পরিষদের সদস্যরা কিংবা কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতার মস্নদে গিয়ে বসে পড়বেন, সে সুযোগ সেখানে নেই। ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নই হবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সমাপ্ত করার পরই কেবল উঠতে পারে মস্নদে বসার প্রশ্ন, তার আগে কখনই নয়। নির্ধারিত মেয়াদের আগে শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজ সমাধা করতে না পারলে দেশ বিপর্যয়ের কোন্ অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে তা ভাবতেও দেশপ্রেমিক মাত্রেরই গা শিউরে উঠার কথা। এতে বিচলিত বোধ করবেন না কেবল তাঁরাই যাঁরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনগণকে দূরে সরিয়ে রেখে অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় বহাল হওয়ার খোয়াব দেখেন অথবা সে কাজে সিদ্ধহস্ত।

জনগণের ইচ্ছাই শেষ কথা

আওয়ামী লীগ জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বিশ্বাসী, আর বিশ্বাসী বলেই তাঁদের হয়ে জন্মাবধি তারা সংগ্রাম করে এসেছে। জনগণের অভিরুচি অনুযায়ী দেশ শাসিত হউক, এই কামনাই তাদের সংগ্রামী চেতনার মূল উৎস। তাই পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই জনগণের সুস্পষ্ট ম্যাণ্ডেটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে দেশকে যখন বিপথে পরিচালিত করার ষড়যন্ত্র হয়, তখন তা নস্যাৎ করার জন্য তারা দেশব্যাপী জাতীয় ভিত্তিক সাধারণ নির্বাচন চেয়েছে। আর জনগণের প্রতি আস্থাহীন, দেশ ও দেশের সম্পদ লুট করে ভাগ্য গড়ার নীতিতে বিশ্বাসী আমাদের প্রতিপক্ষীয় একশ্রেণীর রাজনীতিকরা কায়েমী স্বার্থ, আমলাতন্ত্র ও পশ্চিমাঞ্চলের সামন্ত নেতৃত্বে জোতদার, জায়গীরদারদের সাথে হাত মিলিয়ে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সব প্রচেষ্টাই এ যাবৎ নস্যাৎ করে এসেছেন। আজও সে চেষ্টার বিরাম নেই।

সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এই সোনার বাংলাকে শোষণের চারণ ক্ষেত্রে পরিণত করার দুরভিসন্ধিতে মেতে নেপথ্যের একশ্রেণীর কুচক্রীরা যে মতলব এঁটেছিল , এই বাংলার 'মীর জাফররাই বার বার সে মতলবের বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার হয়ে কাজ করে এসেছে, আর তাই এদেশের তেরো কোটি মানুষের আজ এ দুরবস্থা। ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে কায়েমী স্বার্থ, আমলাতন্ত্র ও পশ্চিমাঞ্চলের সামন্তবাদী

নেতৃত্বের চক্র ও চক্রান্তের প্রতিভূস্থানীয় যে মুসলিম লীগকে বাংলার বুক থেকে সমূলে উচ্ছেদ করা হয়েছিল , কয়েকটি মাস না যেতেই বাংলার কোন্ সে ছদ্মবেশী 'সু-সন্তানরা' সেই মুসলিম লীগ চক্রের সাথেই রাতারাতি হাত মিলিয়ে বাংলার সাত কোটি মানুষের স্বার্থবিরোধী শাসনতন্ত্র রচনায় মত্ত হয়েছিলেন , তাও কারও অজানা নয়। পরবর্তীকালে দেশে জাতীয় ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বে রাতের অন্ধকারে ক্ষমতা দখল করে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান যখন এদেশের বারো কোটি মানুষের শত অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে দেশব্যাপী 'কবরে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হয়েছিলেন, মোনেম খাঁ জাতীয় বাংলার কোন সে মীর জাফর সেই স্বৈরাচারী শাসকের গললগ্ন হয়ে সোনার বাংলাকে অপর অঞ্চলের উপনিবেশ তথা শ্মশানে পরিণত করার চক্রান্ত বাস্তবায়নের 'পবিত্র দায়িত্ব পালনে সদা সচেষ্ট ছিলেন, যে কাহিনীরও পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন পড়ে না।

বাংলার করুণ ইতিহাস

তাই বলি, বাংলা আর বাঙালীর ইতিহাস — সিরাজদ্দৌলা বনাম মীর জাফরের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস — বাংলার আপামর মানুষ বনাম জনাব মোনেম খাঁনেরই ইতিহাস। এ ইতিহাস বড় করুণ, বড় মর্মন্তুদ। এ ইতিহাস আবার গৌরবদীপ্তও বটে। বাংলার কচি প্রাণ ছালাম-বরকতের তপ্ত তাজা রক্তের পিচ্ছিল পথে নূরুল আমীনের, আর সার্জেন্ট জহুর-মনুমিয়া-আসাদ-শম্ভু-আলাউদ্দিন আর আনোয়ারাদের শোকসন্তপ্ত মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগিনীর তপ্ত অশ্রুর রোষাণলে মোনেম খাঁনের ক্ষমতার আসনচ্যুতিও এদেশের ইতিহাসের কত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তবু শিক্ষা তাদের হয়নি। হয়তো বা অতীতে যারা ইসলামের দোহাই দিয়ে এ দেশকে কায়েমী স্বার্থের অবাধ শোষণ ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছিলেন আপনি , আমিও সে ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা নিতে পারিনি। সে শিক্ষা যদি তাদের হত; অথবা দেশবাসী যদি তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হতেন তাহলে ১৯৬৯ এর প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থানের মুখে সেদিন যাঁরা নিজ নাম-ঠিকানা গোপন করে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা আজ আবার তাদেরই কথিত এদেশের 'গুরু-ছাগলের' দরবারে ভোটপ্রার্থী হন বা হতে পারেন কোন্ দুঃসাহসে। আমার বিচারে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিচার বুদ্ধির প্রতি এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ , এক মহা অগ্নি-পরীক্ষা। এ চ্যালেঞ্জের জবাব জনসাধারণ কিভাবে দিবেন, এ অগ্নি-পরীক্ষায় কিভাবেই বা তাঁরা উত্তীর্ণ হতে চান, তা তাঁদেরই বিবেচ্য।

তবে, আমি যা বুঝি, আমার দলীয় সহকর্মীরা যা বুঝেন অথবা এদেশের সংগ্রামী ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক সমাজ যা বুঝেন এক কথায় তাহল এই যে, এবারকার সাধারণ নির্বাচনই বাংলার সাড়ে সাত কোটি তথা সারাদেশের তেরো কোটি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের প্রথম ও শেষ সুযোগ। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে কেউ যদি ভেবে থাকেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে তিনি সক্ষম হবেন, তবে ভুল করবেন নিঃসন্দেহে। আর সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয়তো বা কোনদিনই আর সম্ভব হয়ে

উঠবে না। জনগণের এত দিনের সংগ্রাম, সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পর দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব ও সুযোগ আবারও যদি সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক নীতিবিরোধী সেই একই পুঁজিবাদী, ধনকুবের, দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থশিকারী, আমলাতন্ত্র বা একনায়কত্ববাদের হাতে চলে যায় তাহলে দেশ ও দশের সর্বনাশ অবধারিত। আর বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিক আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকালে জনগণ ভোটাধিকারটুকুর যথাযথ সদ্ব্যবহার ও নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে কুচক্রীদের হাত থেকে সে দায়িত্ব ও সুযোগ যদি ছিনিয়ে আনতে পারেন তবেই দেশ ও দশের কল্যাণ। এই কারণেই আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

মুক্তকণ্ঠের আওয়াজ চাই

ভুললে চলবে না যে, পাকিস্তানে এবারই সর্বপ্রথম জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের দ্বারা এ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মূল সম্পদ শাসনতন্ত্র রচিত হতে চলেছে। বাংলাকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে হলে, এ দেশের বারো কোটি মানুষকে সত্যিকার মুক্তির সন্ধান দিতে হলে চাই মুক্তকণ্ঠের আওয়াজ — সে আওয়াজ তুলতে হবে বাংলারই জনপ্রতিনিধিদের। পশ্চিম পাকিস্তানের অসহায় মানুষের ভোটে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসবেন তাদের অধিকাংশই জীবনে সামন্ত স্বার্থেরই প্রতিভু। তাদের কণ্ঠে কখনও দেশের কৃষক শ্রমিক তথা সর্বহারা মানুষের স্বার্থের কথা ধ্বনিত হতে পারে না। বরং নিজেদের স্বার্থেই তারা চাইবেন গণস্বার্থকে দাবিয়ে রাখতে। জাতীয় পরিষদে তাদেরকে মোকাবিলা করে এদেশের আপামর মানুষের স্বার্থ ও অধিকার ছিনিয়ে এনে পাকাপাকিভাবে শাসনতন্ত্রে স্থান দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে কেবল বাংলার মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ঐক্য। ভিন্ন ভিন্ন দলের পৃথক চিন্তাধারার প্রতিনিধিদের কণ্ঠে বেসুরো আওয়াজ উঠতে বাধ্য। তার উপর রয়েছে বাংলার মীরজাফরদের ভুমিকা। ইতিমধ্যেই অন্যান্য রাজনৈতিক দল কেউ একশত, কেউ বা ৩০/৪০টি আসনে দলীয় প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এসব দলের সব কয়টিরই শিকড় পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলাদেশের জন্য তাদের এমনই দরদ যে, পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পেলেও, বাংলাদেশের বেলায় 'যে কয়টি আসন পাওয়া যায় ভাল' এই নিয়মেই তারা নির্বাচনে নামছেন। তারা যে বাংলার তথা আপামর জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, তার সবচাইতে বড় প্রমাণ তারা নির্বাচনে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কোন চেষ্টাই করতে চান না। তারা জানেন, যেন-তেন প্রকারে গুটিকয়েক আসন যদি তারা এখান থেকে পার করিয়ে নিতে পারেন তাহলে তাদেরকে বগলদাবা করে যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বাংলাকে সংখ্যালঘু করে নিজেদের স্বাথ আদায়ের পথ ঠিকই করে নিতে পারবেন। এ দুরভিসন্ধি সম্পর্কে তাই বাংলার মানুষকে সজাগ থাকতে হবে।

সত্যের ভিত্তিতে ছয় দফা

আরেকটি প্রশ্ন হল, নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ অনেক দলই বাংলার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে চলেছেন। কিন্তু কিভাবে দেশের দু'অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হবে, কি করে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্রতম প্রদেশগুলির মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, তার কোন কর্মসূচীই জনসাধারণের সামনে তাঁরা ঘোষণা করেননি। ব্যক্তিগত স্বার্থের রাজনীতি আওয়ামী লীগ করে না। রাজনীতির অঙ্গনে 'ঢাক ঢাক গুড় গুড় নীতিতেও আমরা বিশ্বাসী নই। তাই, জনগণের জন্য আমরা যা চাই তা সুস্পষ্ট ভাষায়, সরাসরি ঘোষণা করি। এ কারণে, আমাদের বহু নির্যাতনও পোহাতে হয়, কখনও 'রাষ্ট্রদ্রোহী, কখনও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী আবার কখনও 'বিদেশী চরের আখ্যাও আমাদের পেতে হয়েছে। তবু জনগণের জন্য যা সত্য ও সুন্দর বলে জেনেছি তা থেকে আমরা কখনও বিচ্যুত হইনি। রক্তচক্ষুর সামনে সত্যকে বর্জন করিনি–রক্তচক্ষু দিয়েই তার জবাব দিয়েছি। দীর্ঘ তেইশ বছর অত্যাচার , নির্যাতন , শাসন, শোষণ আর বঞ্চনার তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করে সর্বশেষ কর্মসূচী হিসাবে আমার দল ৬ দফাকে জাতির সামনে পেশ করেছে। এদেশের সংগ্রামী ছাত্র সামজও ৬ দফার অনুধাবন করে তাদের ১১ দফা কর্মসূচীতে ৬ দফাকে স্থান দিয়ে সংগ্রাম করে চলেছে। পাকিস্তানের ১২ কোটি মানুষের সত্যিকার মুক্ত চিন্তার স্বর্ণফসল হিসাবে কাউন্সিল অধিবেশনেও কর্মিসমাজ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ৬ দফা। এই কর্মসূচীকে আওয়ামী লীগ কারও উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়নি। ৬ দফার গুণাগুণ বিচারের ভার আমরা জনগণের উপরই ছেড়ে দিয়েছি। ৬ দফা বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ, ৬ দফা শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার, ৬ দফা মুসলিম-হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙালি জাতির স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ আর নির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি, ৬ দফা বাঙালির আত্মমর্যাদায় সম্মানজনক আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী, ৬ দফার সংগ্রাম আমাদের জীবন মরণের সংগ্রাম। তাই এবারকার নির্বাচনে আমার দলের জয়ের অর্থ ৬ দফারই জয় আর ৬ দফার জয়ের অর্থ এদেশের লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত সাধারণ মানুষের মুক্তি সংগ্রামের জয়।

লেবেল সর্বস্ব ইসলাম নয়

আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। একথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য-লেবেল সর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রসূলে করীম (দঃ)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বরাবর যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদেরই বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জনই মুসলমান সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাসের সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারেন কেবল তাঁরাই ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা ফায়স্থা করে তোলার কাজে।

কথা তোলা হয়েছে যে, নির্বাচনী ঐক্যজোটে সম্মত না হয়ে আমরা বাংলার স্বার্থেরই ক্ষতি করছি। এর উত্তর হল ঃ বাংলার স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আমরা নির্বাচনী ঐক্যজোটে আর বিশ্বাসী নই। অতীতে বহুবার, এমনকি ১৯৫৪ সালে ঐক্যজোট গঠনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। বাংলার মানুষ গভীর আশায় বুক বেঁধে যুক্ত ফ্রন্টকে জয়যুক্ত করেছিল, কিন্তু, আমরা দেখেছি যুক্ত ফ্রন্টের নাম নিয়েই আওয়ামী লীগ সদস্যরা ছাড়া আর সব অঙ্গ দলের সদস্যরাই কেন্দ্রের সেই ধিকৃত দলটিতেই ভিড়ে গিয়েছেন, যে দলকে দু'দিন আগে বাংলার আপামর মানুষ বাংলার মাটি থেকে সমূলে উৎখাত করেছে। ফলতঃ সর্বনাশ হয়েছে বাংলার আর বাঙালীর , সর্বনাশ হয়েছে এদেশের কোটি মানুষের। তাই এবার আর আমরা ভিন্ন চিন্তাদর্শের মানুষের সাথে ঐক্যজোট গঠন করে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা। এবার আমাদের কথা হল কর্মসূচী বলতে কিছু থেকে থাকলে তার ভিত্তিতে জনগণের দরবারে যান, জনগণ আপনাকে গ্রহণ করলে জাতীয় পরিষদে গিয়ে প্রয়োজন হলে আপনার সাথে ঐক্যজোট গঠন করব, এখন নয়।

আমার জীবনের স্বপ্ন

জাতির এ মহাসন্ধিক্ষণে বাংলার জননায়ক শেরে বাংলা পরলোকে, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীও আজ আমাদের মাঝে নেই। মানিক ভাই-এর ক্ষুরধার লেখনিও আজ চিরতরে সেই কায়েমী স্বার্থের কাছে নিজেদের বিকিয়ে রেখেছেন, নয়তো নির্জীব নিষ্কর্মা হয়ে বসে পড়েছেন, অন্যের শলা পরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। সীমাবদ্ধ সামর্থ্যে দেশবাসীর খেদমত করতে গিয়ে অতীতে বহু পরীক্ষায় আমাকে সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার সংগ্রামী জীবনের স্বপ্ন ও সাধনার আলোকে বিচার করে নিশ্চিতই আজ আমি বুঝতে পারছি ভাগ্যাহত বাংলার–এদেশের আপামর তথা সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার বাসনাকে সার্থকরূপ দেওয়ার যে বিরাট গুরুদায়িত্ব আজ আমাদের সামনে, সে দায়িত্ব আজ আমাকেই স্কন্ধে তুলে নিতে হচ্ছে। এদেশের ভাগ্যাহত মানুষের ভাগ্য প্রণয়নের দায়িত্ব বাংলার মাটি হতে অঙ্কুরিত আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে। আমি ও আমার দল সে দায়িত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কেবল প্রয়োজন জনগণের দোয়া আর শুভেচ্ছা যা কি-না আমাদের এবারের চলার পথে একমাত্র পাথেয়।

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত হিসাবে জনগণের খেদমতে একটিই মাত্র আমার বক্তব্য ঃ নিজের জীবনের বিনিময়ে যদি এদেশের ভাবি নাগরিকদের জীবনকে কন্টকমুক্ত করে যেতে পারি, আজাদী আন্দোলনের সূচনাতে এদেশের মানুষ মনের পটে যে সুখী সুন্দর জীবনের ছক এঁকেছিল, সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নের পথ কিছুটাও যদি প্রশস্ত করে যেতে পারি তাহলেই আমার সংগ্রাম সার্থক মনে করব।

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। তবু আমার প্রতিপক্ষেরা আমাকে এ অপবাদ দিয়ে চলেছেন। বিগত ২৩ বৎসর ধরে ক্ষমতার আসন আমি কবে কখনও আঁকড়ে ধরেছি তার বিবরণ তারা দেন না। বিগত গোল টেবিল বৈঠকের সময় আমাকে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আমি তা দু'পায়ে ঠেলে দিয়েছি। এতে আমার প্রতিপক্ষের বন্ধুদের অনেকে রুষ্ঠও হয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভালাভ বা স্বার্থের

বখরায় শরীক হয়ে দেশবাসীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া আমার রাজনীতির লক্ষ্য কোনদিন ছিল না, আজও নাই। তাই রুষ্ঠ হলেও প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রলোভনের মুখে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থের প্রশ্নে নিজ বিবেককে আমি বিকিয়ে দিতে চাইনি। তাঁদের দৃষ্টিতে এ আমার অপরাধ হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় দেশবাসীর দৃষ্টিতে নয়।

লোকশক্তির প্রত্যাশী

ক্ষমতার প্রত্যাশী আমি নই, তবে শক্তির প্রত্যাশী আমি বটে–কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন অনিচ্ছুক মহলের হাত থেকে দেশবাসীর স্বার্থ ছিনিয়ে আনতে শক্তি আমরা চাই-ই চাই। সে শক্তি জোগাতে পারেন কেবল জনগণই। একারণে জনগণের খেদমতে একটিই মাত্র আমার প্রার্থনা ঃ জাতীয় পরিষদে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষের হয়ে এক কণ্ঠে আওয়াজ তুলে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থ ও অধিকার যাতে আমরা আদায় করে আনতে পারি, তার জন্য জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের ১৬২টি আসনের প্রত্যেকটি আসনে জনগণ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। কারণ জনগণের শাসনতন্ত্র চাহিদামত পাস করিয়ে আনতে হলে অনিচ্ছুক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আমার চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিজয়ের চাবিকাঠি। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি তাঁরা আমাকে জাতি, ধর্ম ও দলমত-নির্বিশেষে দেন, তাহলে আমি ওয়াদা দিচ্ছি, তাঁদের স্বার্থ ও অধিকার আমি আদায় করে আনবই। আর যদি আপনাদের বিচারে ভুল হয়, আবার যদি পার্লামেন্টে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের দরুন বাংলার প্রতিনিধিরা দলে দলে ভাগ হয়ে বসে বেসুরো আওয়াজ তুলেন তাহলে হাতে পেলেও সবই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে, আর তার অর্থ হবে এদেশের বারো কোটি মানুষ ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সর্বনাশ। এ সর্বনাশে আপনি আমি জ্ঞানতঃ শরীক হতে পারি কি-না , তা বিচারের ভার আপনাদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি।

বাংলার মীর জাফরদের সম্পর্কে আমি আপনাদের সজাগ করে দিয়ে এই কথাই বলতে চাই যে, তেইশটি বছরের অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও শাসনে বাংলার মানুষ আজ নিঃস্ব, সর্বহারা। ক্ষুধায় তাদের অন্ন নেই, পরনে নেই বস্ত্র, সংস্থান নেই বাসস্থানের। বাংলার অতীত আজ লুপ্ত, বর্তমান অনিশ্চিত, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। জাতির এহেন দুর্দিনে বাংলার ভবিষ্যৎ সন্তানদের বাঁচাবার দায়িত্ব আপনার। জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব পালনের সুযোগ যদি আপনারা আমাকে ও আওয়ামী লীগকে দেন তাহলে এদেশের কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত, যারা আজ সর্বস্ব হারিয়ে রিক্ত ও শূন্য হস্ত, তাদের মুখে ইন্‌শাআল্লাহ আমরা হাসি ফুটাতে পারব এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বাংলার সকল অধিবাসী—সে সংখ্যাগুরুই হউক বা সংখ্যালঘুই হউক সকলকেই আজ দেশাত্মবোধ নিয়ে জেগে উঠতে হবে, মরণপণ করে বাংলার মান-ইজ্জত রক্ষার জন্যে এগিয়ে ডাক দিয়ে কেবল বলে যেতে চাই ঃ জাগো, বাঙালি জাগো। তোমাদের জাগরণেই এদেশের বার কোটি মানুষের মুক্তি।

জয় জনগণের জয়!

জয় বাংলার জয়!!

সকলের সমান অধিকার, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব

যে সংকট জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে তার প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়, জনগণের এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয়, অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অথনৈতিক বৈষম্যের জন্য সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। প্রধানতঃ এগুলোই বাঙ্গালিদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলিত মানুষেরও আজ একই উপলব্ধি।

আওয়ামী লীগের মেনিফেষ্টোতে এসব মৌলিক সমস্যা সমাধানের একটা সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করা হয়েছে। দেশে প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সেই গণতন্ত্রে মানুষের সকল মৌলিক স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিকভাবে নিশ্চিত করা হবে। আমাদের মেনিফেষ্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজে ক্যান্সারের মত যে দুর্নীতি বিদ্যমান তাকে নির্মূল করতে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

অসহনীয় অবিচার

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। জাতীয় শিল্প সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ দুডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যাংকিং সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগ এ দুই ডজন পরিবারের কুক্ষিগত। ব্যাংকের লগ্নীকৃত অর্থের শতকরা ৮২ ভাগ আজ মোট জমাকারীদের মাত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশে যে করপ্রথা কায়েম রয়েছে, তা বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাদমুখী ব্যবস্থা। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যখন প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ আদায় করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ অর্থ আদায় হয়। অপর পক্ষে, লবণের মত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ওপরও নিপীড়নমূলক পরোক্ষ কর বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, ট্যাক্স হলিডে, বোনাস ভাউচারের বিপুল পরিমাণে সাবসিডি প্রদান এবং কৃত্রিমভাবে নিম্নহারে বিদেশী মুদ্রার ঋণ, অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি ব্যবস্থা একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সুযোগ করে দিয়েছে।

ছিঁটেফোঁটা ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও সামন্ত প্রভুরা রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী রয়েছেন। তাঁরা সীমাহীন সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন। তাঁদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র কৃষকের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটেছে। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার দ্রুত ব্যয় বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প শ্রমিক ও মেহনতি সম্প্রদায়ের ওপর। মুদ্রা মজুরি যা বাড়ছে—তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যয় বৃদ্ধির চাপ স্কুল-কলেজের শিক্ষক, স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মচারী, বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন।

ভয়াবহ বৈষম্য

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে – গত বাইশ বছরে সরকারী রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র পনেরো শত কোটি টাকার মত (মোট ব্যয়ের এক পঞ্চমাংশ) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশী। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে বাংলাদেশে মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। বিশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র তেরো শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আমদানী করেছে। বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিনগুণ বেশী বিদেশী দ্রব্য আমদানী করা হয়েছে। নিজস্ব বিদেশী মুদ্রা আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি দুহাজার কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী দ্রব্য আমদানী করতে পেরেছে তার কারণ বাংলাদেশের অর্জিত পাঁচশ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করেছে। তার উপরেও সর্বপ্রকার বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহৃত হয়েছে।

চাকরিতে বাঙালির বঞ্চনা

সরকারী চাকরির ক্ষেত্রের পরিসংখ্যানও ঠিক একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার তেইশ বছর গত হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে বাঙালীর সংখ্যা আজও মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ। দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙালির সংখ্যা মাত্র ১০ ভাগেরও কম। সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ প্রকট বৈষম্যের ফলে বাংলার অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে। বাংলার বেশীরভাগ গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণকে শুধুমাত্র অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ১৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হচ্ছে। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে তার শিকারে পরিণত হয়ে চলেছে বাংলার অসহায় মানুষ। পশ্চিম পকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশী। পশ্চিম পাকিস্তানে যে ক্ষেত্রে মোটা চাউলের দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে ঐ একই চাউলের দাম গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম প্রতিমণ ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১৫ থেকে ২০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিসের সরিষার তেলের দাম মাত্র আড়াই টাকা, কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিসের তেলের দাম পাঁচ টাকা। করাচীতে যে সোনার দাম প্রতি ভরি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, ঢাকায় সে সোনার মূল্য প্রতি ভরি ১৬০ থেকে ১৭০ টাকা। তারপরেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলায় সোনা আনার ব্যাপারে কাস্টমস-এর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

গত বাইশ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অথনীতির যে কাঠামো গড়ে তুলেছেন—এসব অবিচার তারই পুঞ্জিভূত ফলশ্রুতি। এ অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এই সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায়। কেন্দ্রীয় সরকার যত বড় শক্তিশালী হোক না কেন অতীতের অন্যায় অবিচার দূরীকরণ সে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ–চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দে সে ব্যর্থতার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচী, যে কর্মসূচী ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সে কর্মসূচী আঞ্চলিক অন্যায় অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথনির্দেশ করেছে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে যেখানে বাংলার প্রতিনিধিত্ব মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং দেশে যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তাতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করা যায় না। বাংলাদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা বৃহত্তর ব্যয় বরাদ্দ আদায়ের চেষ্টা করলে আঞ্চলিক উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় সমস্যাসমূহের একমাত্র সমাধান হতে পারে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা। প্রস্তাবিত এ স্বায়ত্তশাসনকে পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাও অবশ্যই দিতে হবে। এ জন্যেই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ওপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাদানের ব্যাপারে আমরা সব সময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি। এ কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণসমূহের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার ক্ষমতাও ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলোর হাতে অর্পণ করা উচিত। এভাবে আমরা কেন্দ্রকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার উর্ধ্বে রাখতে চাই। ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ফেডারেশনের সরকারকে পররাষ্ট্র বিষয়ক , দেশরক্ষা বিষয় ও নিরাপত্তামুলক শর্তসাপেক্ষে মুদ্রা ব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে একটা ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ফেডারেল সরকার পরিকল্পনার নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হবে এবং ফেডারেল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল অঞ্চল থেকে ফেডারেল চাকরিতে লোক নিয়োগ করা হবে। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, ফেডারেশনের ইউনিটগুলি যদি মিলিশিয়া অথবা প্যারা-মিলিটারী বাহিনী গঠন করে, তবে তারা কার্যকরীভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনা সংশয় ও বিরোধের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। যে অঞ্চলের মানুষ অপর অঞ্চলকে উপনিবেশ বা বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে চান – বোধগম্য কারণেই তারা আমাদের এ প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের পরিকল্পনা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন পাবে।

আমাদের বিশ্বাস, শাসনতান্ত্রিক এ কাঠামোর মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব এবং অন্যায়, অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর জন্য দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী তখনই

সংঘবদ্ধ আত্মনিয়োগ করবেন যখন ত্যাগ স্বীকারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সকল শ্রেণী সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করার আশ্বাস আমরা দিতে পারবো। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অংশ নিশ্চিত করার জন্যে অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবশ্যই আমূল পবির্তন আনতে হবে। জাতীয়করণের নামে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীগুলোসহ দুর্নীতির মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হবে জনগণের মালিকানায়। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। বেসরকারী পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথা সম্পূর্ণভাবে বিলোপ সাধন করতে হবে। কর ব্যবস্থাকে সত্যিকারের গণমুখী করতে হবে। সৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সূতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্যে অবশ্যই বাজারকরণ ও ঋণ দানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এযাবৎ বাংলার আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া ব্যাপারীরা পাটচাষীদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করেছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তূলার প্রতিও একই ধরনের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সে জন্য আমরা মনে করি, তূলা ব্যবসাও জাতীয়করণ করা অত্যাবশ্যক। তূলার মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সরকারগুলো আমাদের অন্যতম অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু ও তামাকের উৎপাদনের ব্যাপারেও যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে এসব অর্থকরী ফসলের উৎপাদন আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

কৃষি বিপ্লব অত্যাবশ্যক

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম পাকিস্তানে জায়গীরদারী, জমিদারী, সরদারী প্রথার অবশ্যই বিলুপ্তি সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমি দখলের সর্বোচ্চ সীমা অবশ্যই নির্ধারিত সীমার বাইরের জমি এবং সরকারী খাস ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কৃষি ব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষীদের বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ভূমি রাজস্বের চাপে নিষ্পিষ্ট কৃষককুলের ঋণভার লাঘবের জন্যে অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত জমির খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি। আমরা বর্তমান ভূমি রাজস্ব প্রথাও তুলে দেবার কথা ভাবছি।

প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্যে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের বন সম্পদ, ফলের চাষ, গো-সম্পদ, হাঁস মুরগীর চাষ, দুগ্ধ খামার সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্যে অবিলম্বে একটি নৌ গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক মৌল ভিত্তির যে প্রথম তিনটি স্তর সেগুলোকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরী ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটা সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে দূরীভূত করতে হবে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে বিজলী সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচী বাস্তবায়িত করে গ্রামে গ্রামে বিজলী সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা বাংলাদেশে পঁচিশশ কিলোওয়াটস বিজলী উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিক শক্তি এবং জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে হবে। তৃতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা । যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবংগের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টিকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিন্ধু নদের উপর এবং বুড়িগংগা, শীতলক্ষ্যা ও কর্ণফুলীর উপরেও সেতু নির্মাণ করতে হবে। আভ্যন্তরীণ নৌ ও সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সড়ক ও রেল ব্যবস্থার উপরও আমরা যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছি।

শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ

সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ঠ বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশী শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামুলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটা 'ক্রাশ' প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্যে খোলা রাখতে

হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্যে মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ

জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ও উর্দু যাতে ইংরেজীর স্থান দখল করতে পারে সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

নাগরিক জীবনের সমস্যাবলীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো – নিম্ন আয়ের লোকজন অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন। তথাকথিত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টগুলি বিত্তবানদের জন্যে বিলাসবহুল আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত। আর এদিকে বাস্তহারা ও বিত্তহীনের দল এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে মাথা কুটে ফিরছে। ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র নগরবাসীর সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থার প্রয়োজন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এক করুণ পরিবেশ বিদ্যমান। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি করে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপন করা প্রয়োজন। চিকিৎসা গ্রাজুয়েটদের জন্যে ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তন প্রয়োজন। পল্লী এলাকার জন্যে ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তনের প্রয়োজন। পল্লী এলাকার জন্যে বিপুলসংখ্যক প্যারা মেডিকেল পার্সনেলদের ট্রেনিং দেয়া দরকার।

শ্রমিকের ন্যায্য হিস্যা

গণ-আন্দোলনের মতই শিল্প শ্রমিকরা অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দরকষাকষি এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে তাদের মৌলিক স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের বেঁচে থাকার মত মজুরি, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল শ্রম আইন বাতিল করতে হবে। শিল্পকারখানা শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যা দানের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি আশা করা যায়। সমাজের চাহিদা মেটাতে হলে অর্থনীতির সকল খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থনীতির সর্বত্র মজুরির কাঠামো ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন বেতনভুক কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্য দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনতে হবে।

সকল নাগরিকের সমান অধিকারে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে যে, আমরা সবসময়ই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে আসছি। সংখ্যালঘুরাও অন্যান্য নাগরিকদের মতই সমান অধিকার ভোগ করবে।

আইনের সমান রক্ষাকবচ সর্বক্ষেত্রেই পাবে। উপজাতীয় এলাকা যাতে অন্যান্য এলাকার সাথে পুরোপুরি সংযোজিত হতে পারে, তারা যাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপর নাগরিকদের মতোই সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, এজন্য উপজাতীয় এলাকা উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় দ্বীপসমূহ এবং উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারীরা যাতে জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্যে তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনের সাথে মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগণের মতই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রয়োজন

৬ দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে, সে মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি শেষবারের মত আহবান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোন কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না।

পররাষ্ট্রনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে — আজ বিশ্ব জুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোনমতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না। এজন্য আমাদের অবশ্যই সত্যিকারের স্বাধীন এবং জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হবে।

আমরা ইতিমধ্যেই সিয়াটো, সেন্টো ও অন্যান্য সামরিক জোট থেকে সরে আসার দাবি জানিয়ে এসেছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোনও জোটে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে - সে সংগ্রামে আমরা আমাদের সমর্থন জানিয়েছি।

"কারোর প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব"— এই নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। আমরা মনে করি প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত, এর মধ্যে আমাদের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সেজন্য প্রতিবেশীদের মধ্যে বর্তমান বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি।

দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেই এসব কর্মসূচী ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর। আগামী নির্বাচন জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ করে ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোটরূপে আমরা গ্রহণ করেছি। রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিকের বিরুদ্ধে ও বিগত গণঅভ্যুত্থানকালীন দায়েরকৃত

মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করা হলে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দীকেও মুক্তি দিতে হবে।

রাজনীতি ও সেনাবাহিনী

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সশস্ত্র বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের গুরুভার বহন করতে দেয়া কোন প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সশস্ত্র বাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারেই অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, জাতি হিসাবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে — আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবিলা করবোই। প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। যাদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত, তারা শুধুমাত্র একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই একত্রে বসবাস করতে পারে।

গণতন্ত্র ধ্বংসের যে কোন উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে। আমাদের ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এই ধরনের ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশে সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্য প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ১৯৭১ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ

"ভাইয়েরা আমার।"

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

"কি অন্যায় করেছিলাম"।

"নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সংগে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস।

"বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সনে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সনে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সনে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছিল। ১৯৬৬ সনে ৬ দফার আন্দোলনে, ৭ই জুনে আমাদের ছেলেদের গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট এহিয়া খান সাহেবের সংগে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভূট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন প্রথম সপ্তাহের মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলীতে বসবো।

আমি বললাম, এসেম্বলীর মধ্যে আলোচনা করবো, এমনকি আমি এও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও হয় সে তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ওদের সঙ্গে আরাপ করলাম ঃ আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলী। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলীতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম এসেম্বলী চলবে। তারপরে হঠাৎ এক তারিখে এসেম্বলী বন্ধ করে দেয়া হলো। এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেম্বলী ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে, আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পয়ঁত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দে'য়া হল। দোষ দেওয়া হল বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হল আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কি পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী-আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলী। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

টেলিফোনে আমার সংগে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুরী করা হয়েছে। কি করে আমার মা'য়ের কোল খালি করা হয়েছে। কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি না-কি স্বীকার করেছি যে, ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমিতো অনেক আগেই বলেছি, কিসের আর.টি.সি? কার সংগে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সংগে বসব? হঠাৎ আমার সংগে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

"ভাইয়েরা আমার,

পঁচিশ তারিখে এসেম্বলী কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আর. টি. সিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলী কল করেছেন আমার দাবী মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের

প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা এসেম্বলীতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে এসেম্বলীতে বসতে আমরা পারি না। "আমি, আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলো হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ী চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু, সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, জর্জ কোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দফতরগুলো-ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলী চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল ঃ প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার না পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।

"আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই-তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপরে গুলী চালাবার চেষ্টা কর না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যতদূর পারি ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি ঃ আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল। কেউ দেবে না। শোনেন -মনে রাখবেন শত্রু বাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয় কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে- যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সংগে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।

প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা ঃ রক্ত যখন দিতে শিখেছি, রক্ত আরও দেব- এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

জয় বাংলা।

স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়

" This may be my last message, from to-day Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last.Your fight must go on until the last soldier of the pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is ours."

[অনুবাদ ঃ ' সম্ভবতঃ এটাই আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যাই তোমাদের হাতে আছে তার দ্বারাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে হবে।যতক্ষণ না পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ ব্যক্তি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে, তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।]

এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ট্রান্সমিটারে প্রেরিত হয়।

এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাংলায় নিম্নলিখিত একটি ঘোষণা পাঠানঃ

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোষ নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

আমি মৃত্যুদন্ডের জন্য অপেক্ষা করছিলাম

৯ জানুয়ারী. ১৯৭২ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর লন্ডনে সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃত্তি

বাংলার মুক্তি সংগ্রামে আজ আমি স্বাধীনতার অপরিসীম ও অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি। এই মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। আমার জনগণ যখন আমাকে বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রপতি' হিসাবে ঘোষণা করেছে তখন আমি 'রাষ্ট্রদ্রোহ'- এর দায়ে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী হিসাবে একটি নির্জন ও পরিত্যক্ত সেলে বন্দী জীবন কাটাচ্ছি। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগিতাদানের জন্য ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোলান্ড, ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে আমি ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থনদানকারী মার্কিন জনগণ ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব সত্য। এদেশকে বিশ্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। বাংলাদেশ অবিলম্বে জাতিসংঘের সদস্য পদের জন্য অনুরোধ জানাবে। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে বিচারের নামে এক প্রহসন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শুনানী অর্ধেক সমাপ্ত হওয়ার পর পাক কর্তৃপক্ষ আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগ করে। আমি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্টে 'বিশ্বাসঘাতক'-এর কলঙ্ক নিয়ে মৃত্যুদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর, আমার বিচারের জন্য যে ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়েছিল তার রায় কখনো প্রকাশ করা হবে না। সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিচারের নামে প্রহসন অনুষ্ঠান করে আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর ফন্দি এঁটেছিলেন। কিন্তু ভুট্টো এই মৃত্যুদন্ড কার্যকরী করতে অস্বীকার করেন। জনাব ভুট্টো আমাকে না বলা পর্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিজয় সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। জেলখানা এলাকায় বিমান আক্রমণের জন্য নির্দেশ জারি করার পর আমি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কথা জানতে পারি। জেলখানায় আমাকে এক নিঃসঙ্গ ও নিকৃষ্ঠতম কামরায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল। যেখানে আমাকে তারা কোন রেডিও, কোন চিঠিপত্র দেয় নাই। এমনকি বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে, তা জানতে দেওয়া হয় নাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের মত এত উচ্চমূল্য, এত ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় জীবন ও দুর্ভোগ আর কোন দেশের মানুষকে ভোগ করতে হয় নাই। বাংলাদেশে নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য পাকিস্তানী সৈন্যরা দায়ী। হিটলার যদি আজ বেঁচে থাকতো, বাংলাদেশের হত্যাকাণ্ডে সেও লজ্জা পেত। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যে কোন একটি সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারটি বিবেচনা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি তাঁকে বলেছি, আমার দেশবাসীর সাথে আলাপ-আলোচনা না করে আমি কোন কিছু বলতে পারবো না।

- আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজী নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই।

ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব আমি বাঙালী, বাংলা আমার দেশ বাংলা আমার ভাষা

পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ

গত ৭ই মার্চ এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালীও প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নেই।

আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয়হারা। তারা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই দুঃখী মানুষদের সাহায্য দানের জন্যে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।

নেতা হিসাবে নয়, ভাই হিসাবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে—পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের রাস্তা-ঘাট ভেঙ্গে গেছে, সেগুলো মেরামত করতে হবে। অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্যে কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দিন এবং আমার অন্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।

আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভায়েরা, আপনাদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আমি চাই, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, আমাদের মা-বোনের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত করেছে, তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোন আক্রোশ নেই। আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমরাও স্বাধীন থাকি। বিশ্বের অন্য যে কোন রাষ্ট্রের সাথে আমাদের যে ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে, আপনাদের সাথেও আমাদের শুধুমাত্র সেই ধরনের বন্ধুত্বই হতে পারে। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারের লোক মারা যায়নি।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান ৪র্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনীতি করেছেন। তিনি শুধু ভারতের মহান সন্তান পন্ডিত জওহের লাল নেহরুর কন্যাই নন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নাতনীও। তাঁর সাথে আমি দিল্লীতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনী তখনই ফিরিয়ে নেবেন। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে।

আমার দেশের জনসাধারণের জন্য শ্রীমতী গান্ধী যা করেছেন , তার জন্যে আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্যে বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান। আমি তাঁর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রায় এক কোটি লোক—যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন - এবং বাকী যারা দেশে রয়ে গিয়েছিলো , তারা সবাই অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। আমাদের এই মুক্তি সংগ্রামে যারা রক্ত দিয়েছে, সেই বীর মুক্তিবাহিনী, ছাত্র

কৃষক-শ্রমিক সমাজ বাংলার হিন্দু-মুসলমান, ইপিআর, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্য আর সবাইকে আমার সালাম জানাই। আমার সহকর্মীরা, আপনারা মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন তার জন্যে আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের মুজিব ভাই আহ্বান জানিয়েছিলেন আর সেই আহবানে সাড়া দিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছেন, তাঁর নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

পাকিস্তানী কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দু'দেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেয়ার জন্য সাহায্য করুন। জয় বাংলা।

বাংলাদেশ-ভারত ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি

অনুচ্ছেদ একঃ

চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ স্ব স্ব দেশের জনগণ যে আদর্শের জন্যে একযোগে সংগ্রাম এবং স্বার্থত্যাগ করেছেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মর্যাদার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, উভয় দেশ এবং তথাকার জনগণের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী বজায় থাকবে একে অপরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে। চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষে উল্লেখিত নীতিমালার ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক সমতা ও সম্মানজনক নীতিসমূহের ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যেকার বর্তমান বন্ধুত্বপূণ সুপ্রতিবেশীসূলভ সার্বিক সহযোগিতার সম্পর্কের আরো উন্নয়ন জোরদার করবে।

অনুচ্ছেদ দুই ঃ

জাতি, ধর্ম-নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি, সমতার নীতিকে আস্থাশীল থাকার আদর্শে পরিচালিত হয়ে চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ সর্বপ্রকারের উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের নিন্দা করছে এবং তাকে চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্যে প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা পুনরুল্লেখ করছে।

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ উপরোক্ত অভিষ্ঠ সিদ্ধির জন্যে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করার এবং উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্য বিরোধী সংগ্রামে জনগণের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্খার প্রতি সমর্থন দান করবে।

অনুচ্ছেদ তিন ঃ

বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা মজবুত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে জোটনিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের অবস্থার পুনরুল্লেখ করছে।

অনুচ্ছেদ চার ঃ

উভয় দেশের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে চুক্তিকারী উভয়পক্ষ সকল স্তরে বৈঠক ও মত বিনিময়ের জন্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

অনুচ্ছেদ পাঁচ ঃ

চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ক্ষেত্রে

পারস্পরিক সুবিধাজনক ও সর্বাত্মক সহযোগিতা শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করে যাবে। উভয় দেশের ক্ষমতা ও পারস্পরিক সুবিধানীতি ভিত্তিক বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রসারিত করবে।

অনুচ্ছেদ ছয় ঃ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং জল বিদ্যুৎ শক্তি ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা ও যৌথ কার্যক্রম গ্রহণে চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ অভিন্ন মত।

অনুচ্ছেদ সাত ঃ

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলার ক্ষেত্রে সম্পর্কের প্রসার করবে।

অনুচ্ছেদ আট ঃ

দুই দেশের মধ্যেকার বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ প্রত্যেকে মর্যাদার সঙ্গে ঘোষণা করছে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোনো সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না বা অংশ নেবে না। অন্যের উপর আক্রমণ থেকেও নিবৃত্ত থাকবে এবং তাদের এলাকার এমন কোনো কাজ করতে দেবে না যাতে চুক্তিকারী কোনো পক্ষের ক্ষতি হতে পারে বা তা কোনো পক্ষের নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অনুচ্ছেদ নয় ঃ

কোনো এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে চুক্তিকারী প্রত্যেককে এতদোল্লেখিত তৃতীয় পক্ষকে যে কোনো প্রকার সাহায্য দানে বিরত থাকবে। তাছাড়া যে কোন পক্ষ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে সেই আশঙ্কা নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে যথাযথ সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে উভয়পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়ে নিজেদের দেশের শক্তি এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ দশ ঃ

চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ ঘোষণা করেছে, এই চুক্তির পক্ষে অসামঞ্জস্য হতে পারে এমন গোপন বা প্রকাশ্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে উভয়ের কেউই কোনো অঙ্গীকার করবে না।

অনুচ্ছেদ এগারো ঃ

এই চুক্তি পঁচিশ বছরের মেয়াদের জন্যে স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তিকারী উভয়পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে। অত্র চুক্তি সই করার দিন থেকে কার্যকরী হবে।

অনুচ্ছেদ বারো ঃ

এই চুক্তি কোনো একটির বা একাধিক অনুচ্ছেদের বাস্তব অর্থ করবার সময় চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য দেখা দিলে তা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার মনোভাবের দ্বারা শান্তিপূর্ণ আলোচনায় নিষ্পত্তি করতে হবে।

আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ডেভিড ফ্রস্টের সাক্ষাৎকার ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৭২

ডেভিড ফ্রস্ট ঃ সে রাতের কথা আপনি বলুন। সেই রাত, যে রাতে একদিকে আপনার সঙ্গে যখন চলছিল আলোচনা এবং যখন সেই আলোচনার আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিচ্ছিল, সেই রাতের কথা বলুন। সেই ২৫শে মার্চ, রাত আটটা। আপনি আপনার বাড়িতে ছিলেন। সেই বাড়িতেই পাকিস্তান বাহিনী আপনাকে গ্রেফতার করেছিল। আমরা শুনেছিলাম, টেলিফোনে আপনাকে সাবধান করা হয়েছিল, সামরিক বাহিনী অগ্রসর হতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু আপনি আপনার বাড়ি পরিত্যাগ করলেন না। আপনি গ্রেফতার হলেন। কেন আপনি নিজের বাড়ি ছেড়ে অপর কোথাও গেলেন না এবং গ্রেফতার বরণ করলেন? কেন এই সিদ্ধান্ত? তার কথা বলুন।

শেখ মুজিবুর রহমান ঃ হ্যাঁ, সে এক কাহিনী। তা বলা প্রয়োজন। সে সন্ধ্যায় আমার বাড়ি পাকিস্তান সামরিক জান্তার কমান্ডো বাহিনী ঘেরাও করেছিল। ওরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। প্রথমে ওরা ভেবেছিল, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে ওরা আমায় হত্যা করবে এবং প্রচার করে দেবে যে, তারা যখন আমার সঙ্গে রাজনৈতিক আপসের আলোচনা করছিল, তখন বাংলাদেশের চরমপন্থীরাই আমাকে হত্যা করেছে। আমি বাড়ি থেকে বেরুনো না বেরুনো নিয়ে চিন্তা করলাম।আমি জানতাম, পাকিস্তান বাহিনী এক বর্বর বাহিনী। আমি জানতাম, আমি আত্মগোপন করলে, ওরা দেশের সমস্ত মানুষকেই হত্যা করবে। এক হত্যাযজ্ঞ ওরা সমাধা করবে। আমি স্থির করলাম, আমি মরি, তাও ভাল, তবু আমার প্রিয় দেশবাসী রক্ষা পাক।

ফ্রস্ট ঃ আপনি হয়ত কলকাতা চলে যেতে পারতেন।

শেখ মুজিব ঃ আমি ইচ্ছা করলে যে-কোন জায়গায় যেতে পারতাম। কিন্তু আমার দেশবাসীকে পরিত্যাগ করে আমি কেমন করে যাব? আমি তাদের নেতা। আমি সংগ্রাম করব। মৃত্যুবরণ করব। পালিয়ে কেন যাব? দেশবাসীর কাছে আমার আহ্বান ছিল, তোমরা প্রতিরোধ গড়ে তোল।

ফ্রস্ট ঃ আপনার সিদ্ধান্ত অবশ্যই সঠিক ছিল। কারণ এই ঘটনাই বিগত ন'মাস ধরে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আপনাকে তাদের একটি বিশ্বাসের প্রতীকে পরিণত করেছে। আপনি তো এখন তাদের কাছে প্রায় ঈশ্বরবৎ।

শেখ মুজিব ঃ আমি তা বলিনে। কিন্তু এ কথা সত্য, তারা আমাকে ভালবাসে। আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালবেসেছিলাম। আমি তাদের জীবনকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হানাদার বর্বরবাহিনী আমাকে সে রাতে আমার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করল। ওরা আমার নিজের বাড়ি ধ্বংস করে দিল। আমার গ্রামের বাড়ি, যেখানে ৯০ বছরের বৃদ্ধ পিতা এবং ৮০ বছরের বৃদ্ধা জননী ছিলেন, গ্রামের সে বাড়িও ধ্বংস করে দিল। ওরা গ্রামে ফৌজ পাঠিয়ে আমার বাবা-মাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে তাদের চোখের সামনে সে বাড়িতে আগুণ ধরিয়ে দিল। বাবা-মার আর কোন আশ্রয় রইল না। ওরা সব কিছুই জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে পেলে ওরা আমার হতভাগ্য মানুষদের হত্যা করবে না। কিন্তু আমি জানতাম, আমাদের সংগঠনের শক্তি আছে। আমি একটি শক্তিশালী সংগঠনকে জীবনব্যাপী গড়ে তুলেছিলাম। জনগণ তার ভিত্তি। আমি জানতাম, তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে। আমি তাদের বলেছিলাম, প্রতি ইঞ্চিতে তোমরা লড়াই করবে। আমি বলেছিলাম, হয়ত এটাই আমার শেষ নির্দেশ। কিন্ত মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত তাদের লড়াই করতে হবে। লড়াই তাদের চালিয়ে যেতে হবে।

ফ্রস্ট ঃ আপনাকে ওরা ঠিক কি ভাবে গ্রেফতার করেছিল? তখন তো রাত ১-৩০ ছিল? তাই নয় কি? তখন কি ঘটলো?

শেখ মুজিব ঃ ওরা প্রথমে আমার বাড়ির ওপর মেশিনগানের গুলী চালিয়েছিল।

ফ্রস্ট ঃ ওরা যখন এল, তখন আপনি বাড়ির কোনখানটাতে ছিলেন?

শেখ মুজিব ঃ এই যেটা দেখছেন, এটা আমার শোবার ঘর। আমি এই শোবার ঘরেই তখন বসেছিলাম। এদিক থেকে ওরা মেশিনগান চালাতে আরম্ভ করে। তারপরে এদিক, ওদিক- সবদিক থেকে গুলী ছুঁড়তে আরম্ভ করে। জানালার উপর গুলী চালায়।

ফ্রস্ট ঃ এগুলো সব তখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল?

শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, সব ধ্বংস করেছিল। আমি তখন আমার পরিবার পরিজনদের সঙ্গে ছিলাম। একটা গুলী আমার শোবার ঘরে এসে পড়ে। আমার ছয়বছরের ছোট ছেলেটি বিছানার ওপর তখন শোয়া ছিল। আমার স্ত্রী এই শোবার ঘরে দু'টি সন্তানকে নিয়ে বসেছিলেন।

ফ্রস্ট ঃ পাকিস্তান বাহিনী কোন দিক দিয়ে ঢুকেছিল?

শেখ মুজিব ঃ সব দিক দিয়ে। ওরা এবার জানালার মধ্য দিয়ে গুলী ছুঁড়তে শুরু করে। আমি আমার স্ত্রীকে দুটি সন্তানকে নিয়ে বসে থাকতে বলি। তারপর তার কাছ থেকে ওঠে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি।

ফ্রস্ট ঃ আপনার স্ত্রী কিছু বলেছিলেন?

শেখ মুজিব ঃ না, কোন শব্দ উচ্চারণের তখন অবস্থা নয়। আমি শুধু তাকে একটি

বিদায় সম্বোধন জানিয়েছিলাম। আমি দুয়ার খুলে বাইরে বেরিয়ে ওদের গুলী বন্ধ করতে বলেছিলাম। আমি বললাম ঃ 'তোমরা গুলী বন্ধ কর। আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা গুলী করছো কেন? কি তোমরা চাও?' তখন চারদিক থেকে ওরা আমার দিকে ছুটে এল, বেয়নেট উদ্যত করে। ওদের একটা অফিসার আমাকে ধরল। ওই অফিসারই বলল ঃ 'এই! ওকে মেরে ফেল না।'

ফ্রস্ট ঃ একটা অফিসারই ওদের থামিয়েছিল?

শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, ঐ অফিসারটি থামিয়েছিল। ওরা তখন আমাকে এখান থেকে টেনে নামাল। ওরা পেছন থেকে আমার গায়ে, পায়ে বন্দুকের কুদো দিয়ে মারতে লাগল। অফিসারটা আমাকে ধরেছিল। তবু ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে টেনে নামাতে লাগল। আমি বললাম ঃ 'তোমরা আমাকে টানছ কেন? আমি তো যাচ্ছি।' আমি বললাম ঃ 'আমার তামাকের পাইপটা নিতে দাও।' ওরা একটু থামল। আমি ওপরে গিয়ে আমার তামাকের পাইপটা নিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী তখন দু'টি ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে কিছু কাপড়-চোপড়সহ একটি ছোট স্যুটকেস দিলেন। তাই নিয়ে আমি নেমে এলাম। চারদিকে তখন আগুন জ্বলছিল। আজ এই যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে ওরা আমায় নিয়ে গেল।

ফ্রস্ট ঃ আপনার ৩২ নং ধানমন্ডি বাড়ি থেকে সেদিন যখন আপনি বেরিয়ে এলেন, তখন কি ভেবেছিলেন, আর কোনদিন আপনি এখানে ফিরে আসতে পারবেন?

শেখ মুজিব ঃ না, আমি তা কল্পনা করতে পারি নি। আমি ভেবেছি, এইই শেষ। কিন্ত আমার মনের কথা ছিল ঃ আজ আমি যদি আমার দেশের নেতা হিসেবে মাথা রেখে মরতে পারি, তাহলে আমার দেশের মানুষের অন্ততঃ লজ্জার কোন কারণ থাকবে না। কিন্তু আমি ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে, আমার দেশবাসী পৃথিবীর সামনে আর মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। আমি মরি, তাও ভাল। তবু আমার দেশবাসীর যেন মর্যাদার কোন হানি না ঘটে।

ফ্রস্ট ঃ শেখ সাহেব, আপনি একবার বলেছিলেন ঃ 'যে-মানুষ মরতে রাজি, তুমি তাকে মারতে পার না।' কথাটি কি এমনি ছিল না?

শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। যে-মানুষ মরতে রাজি, তাকে কেউ মারতে পারে না। আপনি একজন মানুষকে হত্যা করতে পারেন? না, তা কেউ পারে না। এটাই আমার বিশ্বাস। আমি একজন মুসলমান। এবং একজন মুসলমান একবারই মাত্র মরে, দুবার নয়। আমি মানুষ। আমি মনুষত্বকে ভালবাসি। আমি আমার জাতির নেতা। আমি আমার দেশের মানুষকে ভালবাসি। আজ তাদের কাছে আমার আর কিছু দাবি নেই। তারা আমাকে ভালবেসেছে। সবকিছুকে বিসর্জন দিয়েছে। কারণ, আমি আমার সব কিছুকে তাদের জন্য দিবার অঙ্গীকার করেছি। আজ আমি তাদের মুখে হাসি দেখতে চাই। আমি যখন আমার প্রতি আমার দেশবাসীর স্নেহ-ভালবাসার কথা ভাবি, তখন আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই।

ফ্রস্ট ঃ পাকিস্তান বাহিনী আপনার বাড়ীর সব কিছুই লুট করে নিয়েছিল?

শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, আমার সব কিছুই ওরা লুট করেছে। আমার ঘরের বিছানাপত্র,

আলমারী, কাপড়-চোপড় - সব কিছুই লুণ্ঠিত হয়েছে। মিঃ ফ্রস্ট, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এ বাড়ির কোন কিছুই আজ নেই।

ফ্রস্ট ঃ আপনার বাড়ি যখন মেরামত হয়, তখন এসব জিনিস লুণ্ঠিত হয়েছে, না পাকিস্তানীরা সব লুণ্ঠন করেছে?

শেখ মুজিব ঃ পাকিস্তানী ফৌজ আমার সবকিছু লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু এই বর্বরবাহিনী আমার আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড়, আমার সন্তানদের দ্রব্য-সামগ্রী লুণ্ঠন করেছে, তাতে আমার দুঃখ নেই। আমার দুঃখ, ওরা আমার জীবনের ইতিহাসকে লুণ্ঠন করেছে। আমার ৩৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনের দিনলিপি ছিল। আমার একটি সুন্দর লাইব্রেরী ছিল। বর্বররা আমার প্রত্যেকটি বই আর মূল্যবান দলিল-পত্র লুণ্ঠন করেছে। সবকিছুই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিয়ে গেছে।

ফ্রস্ট ঃ তাই আবার সেই প্রশ্নটা আমাদের সামনে আসে- কেন ওরা সবকিছু লুণ্ঠন করল?

শেখ মুজিব ঃ এর কি জবাব দেব? আসলে ওরা মানুষ নয়। কতগুলো ঠগ, দস্যু, উন্মাদ, অমানুষ আর অসভ্য জানোয়ার। আমার নিজের কথা ছেড়ে দিন। তা নিয়ে আমার কোন ক্ষোভ নেই। কিন্তু ভেবে দেখুন, ২ বছর ৫ বছরের শিশু, মেয়েরা- কেউ রেহাই পেল না। সব নিরীহ মানুষকে ওরা হত্যা করেছে। আমি আপনাকে দেখিয়েছি সব জ্বালিয়ে দেওয়া, পোড়া বাড়ি, বস্তি। একেবারে গরীব, না-খাওয়া মানুষ সব বাস করতো এই বস্তিতে। বস্তির মানুষ জীবন নিয়ে পালাতে চেয়েছে। আর সেইসব মানুষের ওপর চারদিক থেকে মেশিনগান চালিয়ে হাজারে হাজারে হত্যা করা হয়েছে।

ফ্রস্ট ঃ কি আশ্চর্য! আপনি বলছেন, ওদের ঘরে আগুন দিয়ে ঘর থেকে বার করে, খোলা জায়গায় পলায়মান মানুষকে মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করেছে।

শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, এমনিভাবে গুলী করে তাদের হত্যা করেছে। যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। ওরা ভেবেছে প্রত্যেকেই শেখ মুজিবের মানুষ। তাই প্রত্যেককেই হত্যা করতে হবে।

ফ্রস্ট ঃ আপনি যখন দেখেন, মানুষ মানুষকে এমনিভাবে হত্যা করছে, তখন আপনার কি মনে হয়? আপনি কি মনে করেন, মানুষ আসলে ভাল? কিংবা মনে করেন মানুষ আসলেই খারাপ?

শেখ মুজিব ঃ ভাল-মন্দ সর্বত্রই আছে। মনুষ্যত্ব আছে, এমন মানুষও আমি দেখেছি। কিন্তু আমি মনে করি, পশ্চিম পাকিস্তানের এই ফৌজ- এগুলো মানুষ নয়। এগুলো পশুরও অধম। মানুষের যে পাশবিক চরিত্র না থাকতে পারে, তা নয়। কিন্তু যে-মানুষ, সে পশুর অধম হয় কি প্রকারে? কিন্তু এই বাহিনী তো পশুরও অধম। কারণ একটা পশু আক্রান্ত হলেই মাত্র আক্রমণ করে। তা নইলে নয়। পশু যদি মানুষকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে, তবু সে তাকে অত্যাচার করে না। কিন্তু এই বর্বরের দল আমার দেশবাসীকে কেবল হত্যা করেনি। দিনের পর দিন বন্দী মানুষকে অত্যাচার করেছে। ৫ দিন, ৭ দিন, ১৫ দিন নির্মম অত্যাচার করেছে, আর হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট ঃ পাকিস্তানে বন্দী থাকাকালে ওরা আপনার বিচার করেছিল। সেই বিচার সম্পর্কে কিছু বলুন।

শেখ মুজিব ঃ ওরা একটা কোর্ট মার্শাল তৈরি করেছিল। তাতে পাঁচজন ছিল সামরিক অফিসার। বাকি কয়েকজন বেসামরিক অফিসার।
ফ্রস্ট ঃ আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনল ওরা?
শেখ মুজিব ঃ অভিযোগ—রাষ্ট্রদ্রোহিতা, পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র— আরও কত কি!
ফ্রস্ট ঃ আপনার পক্ষে কোন আইনজীবী ছিলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন উপায় ছিল?
শেখ মুজিব ঃ সরকারের তরফ থেকে গোড়ায় এক উকিল দিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন দেখলাম, অবস্থাটা এমনি যে, যুক্তির কোন দাম নেই; দেখলাম, এ হচ্ছে বিচারের এক প্রহসন মাত্র, তখন আমি কোর্টে নিজে দাঁড়িয়ে বললাম ঃ জনাব বিচারপতি, দয়া করে আমাকে সমর্থনকারী উকিল সাহেবদের যেতে বলুন। আপনারা বিলক্ষণ জানেন, এ হচ্ছে এক গোপন বিচার। আমি বেসামরিক লোক। আমি সামরিক কোন লোক নই। আর এরা করছে আমার কোর্ট মার্শাল। ইয়াহিয়া খান কেবল যে প্রেসিডেন্ট, তাই নয়। তিনি প্রধান সামরিক শাসকও। এ বিচারের রায়কে অনুমোদনের কর্তা তিনি। এই আদালতকে গঠন করেছেন তিনি।
ফ্রস্ট ঃ তার মানে, তার হাতেই ছিল সব?
শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, সে ছিল দন্ডমুন্ডের কর্তা। তার ইচ্ছাই ইচ্ছা।
ফ্রস্ট ঃ তার মানে, আপনি আদালতে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন?
শেখ মুজিব ঃ তার তো কোন উপায় ছিল না। আমি তো বন্দী।
ফ্রস্ট ঃ হাঁ, তাতো বটেই। আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার তো কোন উপায় ছিল না। ওরা কি বিচার শেষ করে, সরকারীভাবে কোন রায় তৈরি করেছিল?
শেখ মুজিব ঃ ৪ঠা ডিসেম্বর ('৭১) ওরা আদালতের কাজ শেষ করে। সাথে সাথে ইয়াহিয়া খান সব বিচারক, যথা লেফটেন্যান্ট, কর্ণেল, বিগ্রেডিয়ার—এদের সব রাওয়ালপিন্ডি ডেকে পাঠালো রায় তৈরি করার জন্য। সেখানে ঠিক করল, ওরা আমাকে ফাঁসি দেবে।
ফ্রস্ট ঃ আর তাই সেলের পাশে কবর খোঁড়া দেখে আপনি বুঝতে পেরেছিলেন, ওরা ওখানেই আপনাকে কবর দিবে?
শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, আমার সেলের পাশেই ওরা কবর খুঁড়ল। আমার চোখের সামনে।
ফ্রস্ট ঃ আপনি নিজের চোখে তাই দেখলেন?
শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, আমি আমার নিজের চোখে দেখলাম ওরা কবর খুঁড়ছে। আমি নিজের কাছে নিজে বললাম ঃ 'আমি জানি, এ কবর আমার কবর। ঠিক আছে। কোন পরোয়া নেই। আমি তৈরি আছি।'
ফ্রস্ট ঃ ওরা কি আপনাকে বলেছিল ঃ 'এ তো তোমার কবর?'
শেখ মুজিব ঃ না, ওরা তা বলে নি।
ফ্রস্ট ঃ কি বলেছিল ওরা?
শেখ মুজিব ঃ ওরা বলল ঃ 'না, না। তোমার কবর নয়। ধর যদি বোম্বিং হয়, তাহলে তুমি এখানে শেলটার নিতে পারবে।'

ফ্রস্ট ঃ সেই সময়ে আপনার মনের চিন্তা কি ছিল? আপনি কি এই সারাটা সময়, নয়মাস নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করেছেন?
শেখ মুজিব ঃ আমি জানতাম, যে-কোন দিন ওরা আমায় শেষ করে দিতে পারে। কারণ, ওরা অসভ্য, বর্বর।
ফ্রস্ট ঃ এমনি অবস্থায় আপনার কেমন করে কাটত? আপনি কি প্রার্থনা করতেন?
শেখ মুজিব ঃ এমন অবস্থায় আমার নির্ভর ছিল আমার বিশ্বাস, আমার নীতি, আমার পৌনে-আট কোটি মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস। তারা আমায় ভালবেসেছে—ভাই-এর মত, পিতার মত। আমাকে তাদের নেতা বানিয়েছে।
ফ্রস্ট ঃ আপনি যখন দেখলেন, ওরা কবর খনন করেছে, তখন আপনার মনে কার কথা আগে জাগল? আপনার দেশের কথা? না, আপনার স্ত্রী-পুত্র পরিজনের কথা?
শেখ মুজিব ঃ আমার প্রথম চিন্তা আমার দেশের জন্য। আমার আত্মীয়স্বজনদের চাইতেও আমার ভালবাসা আমার দেশের জন্য। আমার যা কিছু দুঃখ ভোগ, সে তো আমার দেশেরই জন্য। আপনি তো দেখেছেন, আমাকে তারা কি গভীরভাবে ভালবাসে।
ফ্রস্ট ঃ হ্যাঁ, একথা আমি বুঝি। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত বাংলাদেশের আপনি নেতা। আপনার প্রথম চিন্তা অবশ্যই আপনার দেশের চিন্তা। পারিবারিক চিন্তা পরের চিন্তা।
শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, জনতার প্রতিই আমার প্রথম ভালবাসা। আমি তো জানি, আমি অমর নই। আজ, কিংবা কাল, কিংবা পরশু আমাকে মরতে হবে। মানুষ মাত্রকেই মরতে হয়। কাজেই আমার বিশ্বাস, মানুষ মৃত্যু বরণ করবে সাহসের সঙ্গে।
ফ্রস্ট ঃ কিন্তু ওরা তো আপনাকে কবর দিতে পারে নি। কে আপনাকে রক্ষা করেছিল সেদিন আপনার ভবিতব্য থেকে?
শেখ মুজিব ঃ আমার বিশ্বাস সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ই আমাকে রক্ষা করেছেন।
ফ্রস্ট ঃ আমি একটা বিবরণে দেখলাম, আপনাকে নাকি জেইলার এক সময়ে সরিয়ে রেখেছিল। ইয়াহিয়া খান যখন আপনাকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল তখন আপনাকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়েছিল। একি যথার্থ?
শেখ মুজিব ঃ ওরা জেলখানায় একটা অবস্থা তৈরি করেছিল মনে হচ্ছিল, কতগুলো কয়েদীকে ওরা সংগঠিত করেছিল যেন সকালের দিকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা আমাকে হত্যা করে ফেলতে পারে। আমার মনে হয়, আমাকে তত্ত্বাবধানের ভার যে-অফিসারের ওপর পড়েছিল, আমার প্রতি তার কিছুটা সহানুভূতি জেগেছিল। হয়ত বা সে অফিসার এমনও বুঝতে পেরেছিল যে, ইয়াহিয়া খানের দিন শেষ হয়ে আসছে। আমি দেখলাম, হঠাৎ রাত তিনটার সময়ে সে এসে আমাকে সেল থেকে সরিয়ে নিয়ে তার নিজের বাংলাতে দু'দিন যাবৎ রক্ষা করল। এ দুম্বদিন আমার ওপর কোন সামরিক পাহারা ছিল না। দু'দিন পরে এই অফিসার আমাকে আবার একটা আবাসিক কলোনীর নির্জন এলাকায় সরিয়ে নিল। সেখানে আমাকে হয়ত চার-পাঁচ কিংবা ছ'দিন রাখা হয়েছিল। এই সময়টাতে আমার অবস্থান সম্পর্কে নিম্নপদস্থ কিছু অফিসার বাদে আর কেউ জ্ঞাত ছিল না।

ফ্রস্ট ঃ এ তাদের সাহসেরই কাজ। এখন তাদের কি হয়েছে, তাই ভাবছি।
শেখ মুজিব ঃ আমিও জানিনে। ওদের ওপর কোন আঘাত হানতে ওরা পারবে বলে মনে হয় না। ওদের জন্য যথাযথ শুভকামনা রয়েছে।
ফ্রস্ট ঃ এমন কি শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়া খান যখন ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, তখনো নাকি সে ভূট্টোর কাছে আপনার ফাঁসির কথা বলেছিল? এটা কি ঠিক?
শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, ঠিক। ভুট্টো আমাকে সে কাহিনীটা বলেছিল। ভূট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার সময়ে ইয়াহিয়া বলেছিল ঃ 'মিস্টার ভুট্টো, আমার জীবনের সব চাইতে বড় ভুল হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি না দেয়া।'
ফ্রস্ট ঃ ইয়াহিয়া এমন কথা বলেছিল!
শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, ভুট্টো একথা আমায় বলে তার পরে বলেছিল ঃ 'ইয়াহিয়ার দাবি ছিল, ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সে পেছনের তারিখ দিয়ে আমাকে ফাঁসি দিবে।' কিন্তু ভুট্টো তার এ প্রস্তাবে রাজি হয় নি।
ফ্রস্ট ঃ ভুট্টো কি জবাব দিয়েছিল? তার জবাবের কথা কি ভুট্টো আপনাকে কিছু বলেছিল?
শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, বলেছিল।
ফ্রস্ট ঃ কি বলেছিল ভুট্টো?
শেখ মুজিব ঃ ভুট্টো ইয়াহিয়াকে বলেছিল ঃ 'না, আমি তা হতে দিতে পারিনা। তাহলে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটবে। বাংলাদেশে এখন আমাদের এক লাখ তিন হাজার সামরিক বাহিনীর লোক আর বেসামরিক লোক বাংলাদেশ আর ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দী রয়েছে। তাছাড়া পাঁচ থেকে দশ লাখ অবাঙালী বাংলাদেশে আছে। মিস্টার ইয়াহিয়া, এমন অবস্থায় আপনি যদি শেখ মুজিবকে হত্যা করেন আর আমি ক্ষমতা গ্রহণ করি, তাহলে একটি লোকও আর জীবিত অবস্থায় বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত আসতে সক্ষম হবে না। তার প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তানেও ঘটবে। তখন আমার অবস্থা হবে সংকটজনক।' ভূট্টো একথা আমাকে বলেছিল। ভুট্টোর নিকট আমি অবশ্যই এ জন্য কৃতজ্ঞ।
ফ্রস্ট ঃ শেখ সাহেব, আজ যদি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটে, আপনি তা হলে তাকে কি বলবেন?
শেখ মুজিব ঃ ইয়াহিয়া খান একটা জঘন্য খুনী। তার ছবি দেখতেও আমি রাজি নই। তার বর্বর ফৌজ দিয়ে সে আমার ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে।
ফ্রস্ট ঃ ভূট্টো এখন তাকে গৃহবন্দী করেছে। ভূট্টো তাকে নিয়ে এখন কি করবে? আপনার কি মনে হয়?
শেখ মুজিব ঃ মিস্টার ফ্রস্ট, আপনি জানেন, আমার বাংলাদেশে কি ঘটেছে? শিশু, মেয়ে, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক ছাত্র—সকলকে ওরা হত্যা করেছে। ৩০ লাখ বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে। অন্ততঃপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ ভাগ ঘরবাড়ি ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং তারপর সব কিছুকে ওরা লুট করেছে। খাদ্যের গুদামগুলিকে ওরা ধ্বংস করেছে।

ফ্রস্ট ঃ নিহতদের সংখ্যা ৩০ লক্ষ, এ কথা আপনি সঠিকভাবে জানেন?
শেখ মুজিব ঃ আমার লোকজন তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। এখনো আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিনি। সংখ্যা হয়ত একেও ছাড়িয়ে যাবে। ত্রিশ লক্ষের কম তো নয়ই।
ফ্রস্ট ঃ কিন্তু এমন হত্যাকান্ড তো নিরর্থক। মানুষকে ঘর থেকে টেনে এনে হত্যা করা।
শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, কাদের ওরা হত্যা করেছে? একেবারে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে। গ্রামের মানুষকে যে-গ্রামের মানুষ পৃথিবীর কথাই হয়ত কিছু জানত না, সে-গ্রামে পাকিস্তানী ফৌজ ঢুকে পাখী মারার মত গুলী করে এই মানুষকে ওরা হত্যা করেছে।
ফ্রস্ট ঃ আমার মনেরও প্রশ্ন ঃ আহা! কেন এমন হল?
শেখ মুজিব ঃ না, আমিও জানিনে। আমিও বুঝিনে। এ রকম পৃথিবীতে আর ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।
ফ্রস্ট ঃ আর এতো ছিল মুসলমানের হাতেই মুসলমানের হত্যা?
শেখ মুজিব ঃ ওরা নিজেরা নিজেদের মুসলমান বলে। অথচ ওরা হত্যা করেছে মুসলমান মেয়েদের। আমরা অনেককে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। আমাদের ত্রাণ শিবিরে এখনও অনেকে রয়েছে। এদের স্বামী, পিতা-সকলকে হত্যা করা হয়েছে। মা আর বাবার সামনে ওরা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। পুত্রের সামনে মাকে ধর্ষণ করেছে। আপনি চিন্তা করুন। আমি এ কথা চিন্তা করে চোখের অশ্রুকে রোধ করতে পারিনা। এরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে কি ভাবে? এরা তো পশুরও অধম। মনে করুন আমার বন্ধু মশিউর রহমানের কথা। আমাদের দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন তিনি। আমাদের সরকারের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন তিনি। তাঁকে নির্যাতন করে করে হত্যা করা হয়েছে। ২৪ দিন ধরে তার উপর নির্যাতন চালিয়েছে। প্রথমে তার এক হাত কেটেছে। তারপরে তার আর একটা হাত কেটেছে। তারপরে তার একটা কানকে কেটেছে। তার পা কেটেছে। ২৪ দিনব্যাপী চলেছে এমন নির্যাতন (শেখ মুজিব কান্নায় ভেঙে পড়েন) কিন্তু এতো একটা কাহিনী। আমাদের কতো নেতা আর কর্মীকে, বুদ্ধিজীবী আর সরকারী কর্মচারীকে, জেলখানায় আটক করে সেখানে থেকে নিয়ে দিনের পর দিন অত্যাচার করে হত্যা করেছে। এমন অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী আমি ইতিহাসে কোথাও শুনি নি। একটা পশু, একটা বাঘও তো মানুষকে হত্যা করলে এমনভাবে হত্যা করে না।
ফ্রস্ট ঃ ওরা কি চেয়েছিল?
শেখ মুজিব ঃ ওরা চেয়েছিল, আমাদের এই বাংলাদেশকে একেবারে উপনিবেশ করে রাখতে। আপনি তো জানেন, মিস্টার ফ্রস্ট, ওরা বাঙালি পুলিশবাহিনীর লোককে, বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করেছে। ওরা বাঙালি শিক্ষক, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, বাঙালি ডাক্তার, যুবক, ছাত্র-সবাইকে হত্যা করেছে।
ফ্রস্ট ঃ আমি শুনেছি, যুদ্ধের শেষ অবস্থাতেও ঢাকাতে ওরা ১৩০ জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে।

শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, সারেণ্ডারের মাত্র একদিন আগে। কেবল ঢাকাতেই ১৩০ নয়, ৩০০ মানুষকে ওরা হত্যা করেছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, মেডিক্যাল কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে। কারফিউ দিয়ে মানুষকে বাড়ির মধ্যে আটক করেছে। আর তারপর বাড়িতে বাড়িতে হানা দিয়ে এইসব মানুষকে হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট ঃ তার মানে, কারফিউ জারি করে সকল খবরাখবর বন্ধ করে হত্যা করেছে।

শেখ মুজিব ঃ হ্যাঁ, তাই করেছে।

ফ্রস্ট ঃ শেখ সাহেব, আপনার কি মনে হয়? ইয়াহিয়া খান কি দুর্বল চরিত্রের লোক, যাকে অন্য লোকে খারাপ করেছে, না, সে নিজেই একটা দস্তুরমত খারাপ লোক?

শেখ মুজিব ঃ আমি মনে করি, ও নিজেই একটা নরাধম। ও একটা সাংঘাতিক লোক। ইয়াহিয়া খান যখন প্রেসিডেন্ট, তখন আমার জনসাধারণের নেতা হিসাবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার সময়েই আমি দেখেছি। ...

ফ্রস্ট ঃ আমাদের আজকের এই আলাপে আপনি নেতা এবং নেতৃত্বের কথা তুলেছেন। যথার্থ নেতৃত্বের আপনি কি সংজ্ঞা দিবেন?

শেখ মুজিব ঃ আমি বলব, যথার্থ নেতৃত্ব আসে সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কেউ আকস্মিকভাবে একদিনে নেতা হতে পারে না। তাকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। তাকে মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। নেতার আদর্শ থাকতে হবে, নীতি থাকতে হবে। এই সব গুণ যার থাকে, সেই মাত্র নেতা হতে পারে।

ফ্রস্ট ঃ ইতিহাসের কোন নেতাদের আপনি স্মরণ করেন, তাঁদের প্রশংসা করেন?

শেখ মুজিব ঃ অনেকেই স্মরণীয়। বর্তমানের নেতাদের কথা বলছিনে।....

ফ্রস্ট ঃ না, বর্তমানের নয়। কিন্তু ইতিহাসের কারা আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছেন?

শেখ মুজিব ঃ আমি আব্রাহাম লিংকনকে স্মরণ করি। স্মরণ করি মাও সে-তুং, লেনিন, চার্চিলকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জন এফকেনেডিকেও আমি শ্রদ্ধা করতাম। .....

ফ্রস্ট ঃ মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

শেখ মুজিব ঃ মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিত জওহরলাল নেহরু, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, কামাল আতাতুর্ক- এদের জন্য আমার মনে গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। আমি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী নেতা ডঃ সুকর্ণকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম। এই সকল নেতাই তো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নেতা হয়েছিলেন।

ফ্রস্ট ঃ আজ এই মুহূর্তে অতীতের দিকে তাকিয়ে আপনি কোন দিনটিকে আপনার জীবনের সব চাইতে সুখের দিন বলে গণ্য করবেন? কোন মুহূর্তটি আপনাকে সব চাইতে সুখী করেছিল?

শেখ মুজিব ঃ আমি যেদিন শুনলাম, আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সে দিনটিই ছিল আমার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন।

ফ্রস্ট ঃ এমন দিনের স্বপ্ন আপনি কবে থেকে দেখতে শুরু করেন?

শেখ মুজিব ঃ বহুদিন যাবৎ আমি এই স্বপ্ন দেখে আসছি।

ফ্রস্ট ঃ স্বাধীনতার সংগ্রামে আপনি কবে প্রথম কারাগারে যান?

শেখ মুজিব ঃ আমার জেল গমন শুরু হয়, বোধ হয়, সেই ১৯৪৮ সনে। আমি তারপরে ১৯৪৯ সনে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাই এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত জেলে থাকি। ১৯৫৪ সালে আমি একজন মন্ত্রী হই। আবার ১৯৫৪ সালেই গ্রেপ্তার হই এবং ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত জেলে থাকি। আবার ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান আমাকে জেলে পাঠায় এবং তখন পাঁচ বছর অন্তরীণ থাকি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ নানা মামলায় আমাকে সরকার পক্ষ বিচার করেছে। ১৯৬৬ সালে আবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৩ বছর যাবৎ আটক রাখা হয়। তারপর আবার ইয়াহিয়া খান গ্রেপ্তার করে। এমন দীর্ঘ সংগ্রাম কেবল ব্যক্তিগতভাবে আমার নয়। আমার বহু সহকর্মীর জীবনই এই ইতিহাস। .....

ফ্রস্ট ঃ মিস্টার প্রাইম মিনিষ্টার, পৃথিবীর মানুষের জন্য কি বাণী আমি আপনার কাছ থেকে বহন করে নিয়ে যেতে পারি?

শেখ মুজিব ঃ আমার একমাত্র প্রার্থনা—বিশ্ব আমার দেশের মানুষের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে আসুক। আমার হতভাগ্য স্বদেশবাসীর পাশে এসে বিশ্বের মানুষ দাঁড়াক। আমার দেশের মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্য যেমন দুঃখ ভোগ করেছে, এমন আত্মত্যাগ পৃথিবীর খুব কম দেশের মানুষকেই করতে হয়েছে। মিস্টার ফ্রস্ট, আপনাকে আমি আমার একজন বন্ধু বলে গণ্য করি। আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনি আসুন। নিজের চোখে দেখুন। আপনি নিজের চোখে অনেক দৃশ্য দেখেছেন। আরো দেখুন। আপনি আমার এই বাণী বহন করুন—সকলের জন্যই আমার শুভেচ্ছা। আমি বিশ্বাস করি, আমার দেশের কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে এসে বিশ্ব দাঁড়াবে। আপনি আমার দেশের বন্ধু। আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

ডেভিড ফ্রস্ট ঃ জয় বাংলা! আমিও বিশ্বাস করি, বিশ্ববাসী আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। আপনাদের পাশে এসে আমাদের দাঁড়াতে হবে। নয়ত ঈশ্বর আমাদের কোন দিন ক্ষমা করবেন না।

বাংলাদেশ শান্তি ও সংগ্রামের প্রতীক

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রদত্ত প্রথম বাংলা ভাষণ

আজ এই মহান পরিষদে আপনাদের সামনে দুটো কথা বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। মানব জাতির এই মহান পার্লামেন্টে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রতিনিধিত্ব লাভ করায় আপনাদের মধ্যে যে সন্তোষের ভাব লক্ষ্য করেছি- আমিও তার অংশীদার। বাঙালি জাতির জন্য এটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কারণ তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম আজ বিরাট সাফল্যে চিহ্নিত।

একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে মুক্ত ও সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকারের জন্য বাঙালি জাতি বহু শতাব্দী ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। তারা চেয়েছে বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করতে।

জাতিসংঘ সনদে যে মহান আদর্শের কথা বলা হয়েছে তা আমাদের জনগণের আদর্শ এবং আদর্শের জন্য তারা চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে। এমন এক বিশ্বব্যবস্থা গঠনে বাঙালি জাতি উৎসর্গীকৃত, যে ব্যবস্থায় সকল মানুষের শান্তি ও ন্যায় বিচার লাভের আকাংখা প্রতিফলিত হবে এবং আমি জানি আমাদের এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মধ্যে আমাদের লাখো লাখো শহীদের বিদেহী আত্মার স্মৃতি নিহিত রয়েছে। আমাদের জন্য বিশেষ সৌভাগ্যের কথা, বাংলাদেশ এমন এক সময়ে জাতিসংঘে প্রবেশ করেছে- যখন এই পরিষদের প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করেছেন এমন এক মহান ব্যক্তি যিনি ছিলেন একজন সক্রিয় মুক্তি সংগ্রামী।

শান্তি ও ন্যায়নীতির সংগ্রাম

মাননীয় প্রেসিডেন্ট, গত বছর আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন সফল করে তোলার কাজে আপনার অবদানের কথা স্মরণ করছি। যাঁদের মহান আত্মত্যাগে বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘে স্থান লাভে সক্ষম হয়েছে- এই সুযোগে আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যে সব দেশ ও জাতি সমর্থন জানিয়েছেন আমি তাঁদের প্রতিও জানাই আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা। নবলব্ধ স্বাধীনতা সংহত করার কাজে, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে এবং জনগণের জন্য

অধিকতর কল্যাণকর কাজে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার কাজে যে সব দেশ ও জাতি বাংলাদেশকে সাহায্য করেছেন আমি তাঁদেরও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। জাতিসংঘে আমাদের আসন গ্রহণকে যাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন- আমি তাঁদেরও বাংলাদেশের জনসাধারণের আন্তরিক ধন্যবাদ পৌঁছে দিচ্ছি। বাংলাদেশের সংগ্রাম ন্যায় ও শান্তির জন্য সার্বজনীন সংগ্রামের প্রতীক স্বরূপ। সুতরাং বাংলাদেশ শুরু থেকে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়াবে এটাই স্বাভাবিক।

জাতিসংঘের জন্মের পর তার এক চতুর্থাংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তার আদর্শ বাস্তবায়নে বিরাট বাধার মুখে অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। জাতিসংঘের সনদে যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা অর্জনের জন্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার লাখো লাখো মুক্তি সেনানীকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। এই সংগ্রাম এখনো চলছে। গায়ের জোরে বে-আইনীভাবে এলাকা দখল, জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে নস্যাৎ করার কাজে শক্তির ব্যবহার ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে চলেছে এই যুদ্ধ। এ যুদ্ধ ব্যর্থ হয়নি। আলজেরিয়া, ভিয়েৎনাম, বাংলাদেশ ও গিনি বিসাউ-এ বিরাট জয় অর্জিত হয়েছে। এ জয় দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে ইতিহাস জনগণের পক্ষে ও ন্যায়ের চূড়ান্ত বিজয় অবধারিত।

ভবিষ্যতের পথ

পৃথিবীর বহু স্থানে অন্যায়-অবিচার এখনো চলছে। আমাদের আরব ভাইয়েরা এখনো লড়ছেন তাঁদের ভূমি থেকে জবর দখলকারীদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য। প্যালেষ্টাইনী জনগণের ন্যায়সঙ্গত জাতীয় অধিকার এখানো অর্জিত হয় নাই। উপনিবেশবাদ উচ্ছেদের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হলেও চূড়ান্ত লক্ষ্যে এখনো পৌঁছেনি। একথা আফ্রিকার জন্য আরো দৃঢ়ভাবে সত্য। সেখানে জিম্বাবুই ও নামিবিয়ার জনগণ জাতীয় স্বাধীনতা ও চরম মুক্তির জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামে এখনো ব্যাপৃত। বর্ণবৈষম্য এই পরিষদে চরম অপরাধ বলে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের বিবেককে তা এখনো ধ্বংস করছে। একদিকে অন্যায় অবিচারের ধারাকে উৎখাতের সংগ্রাম অন্যদিকে বিরাট চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে। আজ বিশ্বের সকল জাতি পথ বেছে নেয়ার কঠিন সংগ্রামের সম্মুখীন। এই পথ বাছাই করার প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ। অনাহার, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও বুভুক্ষার তাড়নায় জর্জরিত, পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার শঙ্কায় শিহরিত বিভীষিকাময় জগতের দিকে আমরা এগুবো, না, আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম। এই ভবিষ্যৎ হবে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত। বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বন্টনের দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেওয়া যাবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে।

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা

সাম্প্রতিককালে গোটা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে আমাদের আরো ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ বছরের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত এই পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বিশ্বের বর্তমান গুরুতর অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আমি এমন একটি দেশের পক্ষ থেকে কথা বলছি- যে দেশটি বর্তমানে অর্থনৈতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে। এ ক্ষতি কতটা গুরুতর- আমি সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপরই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। তারপর থেকে আমরা একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি। সর্বশেষে এবার নজীরবিহীন বন্যা। সাম্প্রতিক বন্যা বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা জাতিসংঘ, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ও সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে কৃতজ্ঞ। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদীন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুতেফ্লিকা বাংলাদেশের সাহায্যের জন্য জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

বন্ধু দেশসমূহ ও মানবকল্যাণ সংস্থাগুলোর কাছ থেকেও ভালোই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাংলাদেশের অগ্রগতি শুধু প্রতিহত করেনি- দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন আমাদের মতো একটি দেশের জন্য দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকার ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। জনসাধারণের জীবনধারণের মান নিছক বেঁচে থাকার পর্যায় থেকেও নীচে নেমে গেছে। মাথাপিছু যাদের বার্ষিক আয় ১০০ ডলারেরও কম তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম খাদ্য প্রয়োজন তারও থেকে কম খাদ্য খেয়ে যারা বেঁচে ছিল তারা সম্পূর্ণ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। দরিদ্র অভাবী দেশগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আভাস দেয়া হয়েছে তা আরো হতাশাজনক।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে খাদ্যের দাম গরীব দেশগুলোর ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। অন্যদিকে ধনী ও উন্নত দেশগুলিই হচ্ছে খাদ্যের মূল রফতানীকারক। কৃষি যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অসম্ভব দাম বাড়ার ফলে গরীব দেশগুলোর খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টাও তেমন সফল হতে পারছে না। বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় বহু গুণ বেড়ে গেছে। তাদের নিজেদের সম্পদ কাজে লাগানোর শক্তিও হ্রাস পেয়েছে। ইতিমধ্যেই যে সব দেশ ব্যাপক বেকার সমস্যায় ভুগছে তারা তাদের অতি নগণ্য উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোও কেটে ছেঁটে কলেবর ছোট করতে বাধ্য হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হলে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ হারে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। বিশ্বের সকল জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে

এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে অগ্রসর না হলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এমন বিরাট আকার ধারণ করবে- ইতিহাসে যার তুলনা পাওয়া যাবে না। অবশ্য বর্তমানে অসংখ্য মানুষের পুঞ্জীভূত দুঃখ-দুর্দশার পাশাপাশি মুষ্টিমেয় মানুষ যে অভূতপূর্ব বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সুখ-সুবিধা ভোগ করছে তার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে আমাদের মধ্যে মানবিক ঐক্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধের পুনর্জাগরণ। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার স্বীকৃতিই কেবল বর্তমান সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান ঘটাতে সক্ষম। বর্তমান দুর্যোগ কাটাতে হলে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার। বর্তমানের মতো এতো বড়ো চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা জাতিসংঘ অতীতে কখনো করেনি। এ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একটু ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যুক্তির শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা। এ ব্যবস্থায় থাকবে নিজের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রতিটি দেশের সার্বভৌম অধিকারের নিশ্চয়তা। এ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বাস্তব কাঠামো, যার ভিত্তি হবে স্থিতিশীল ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বের সকল দেশের সাধারণ স্বার্থের স্বীকৃতি। এখন এমন একটি সময় যখন আমাদের দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে যে, আমাদের একটা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্ব হল বিশ্বের প্রতিটি মানুষ যাতে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মর্যাদার উপযোগী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। মানবাধিকার সংক্রান্ত সার্বজনীন ঘোষণায় এ অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা অনুযায়ী আমাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব এমনভাবে পালন করতে হবে যাতে প্রতিটি মানুষ নিজের ও পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জীবন ধারণের মান প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আন্তর্জাতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমঝোতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশই যে অর্থনৈতিক দূরবস্থা দূর করতে সক্ষম সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করা সম্ভব হলে অর্থনৈতিক সংকট দূর করার পরিবেশই শুধু গড়ে উঠবে না- এ প্রতিযোগিতার যে বিপুল সম্পদ অপচয় হচ্ছে- তা মানব জাতির সাধারণ কল্যাণে নিয়োগ করা সম্ভব হবে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

বাংলাদেশ প্রথম থেকেই জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছে। এই নীতির মূলকথা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সকলের সঙ্গে মৈত্রী। শান্তির প্রতি যে আমাদের পূণ আনুগত্য তা এই উপলব্ধি থেকে জন্মেছে যে, একমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই আমরা আমাদের কষ্টার্জিত জাতীয় স্বাধীনতার ফল আস্বাদন করতে পারবো। এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগশোক, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের সকল সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হবো। সুতরাং আমরা স্বাগত জানাই সেই সকল প্রচেষ্টাকে, যার লক্ষ্য বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস করা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা সীমিত করা, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাসহ পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থানে শান্তিপূর্ণ সহ-

অবস্থান নীতি জোরদার করা। এই নীতি অনুযায়ী ভারত মহাসাগরকে শান্তি এলাকা রাখার প্রস্তাবে আমরা অবিরাম সমর্থন জানিয়ে এসেছি। ভারত মহাসাগরকে শান্তি এলাকা রাখার প্রভাব এই পরিষদেও সক্রিয় শক্তিশালী অনুমোদন লাভ করেছে।

আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার এলাকারূপে ঘোষণায় অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বিশ্বের যে উদীয়মান জাতিসমূহ একত্রিত হয়েছিলেন, তাঁরা শান্তির পক্ষে শক্তিশালী সমর্থন জুগিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অভিন্ন প্রতিজ্ঞার কথাই আবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার লক্ষ্য জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার। এই শান্তির মধ্যে সারা বিশ্বের সকল নর-নারীর গভীর আশা-আকাংখা মূর্ত হয়ে রয়েছে। ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে শান্তি কখনো স্থায়ী হতে পারেনা।

উপমহাদেশে বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি

আমরা শান্তিকামী বলে আমাদের এই উপমহাদেশে আমরা আপোষ-মীমাংসা নীতির অনুসারী। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের অভ্যুদয় উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছে। এবং অতীতের সংঘাত ও বিরোধের বদলে আমাদের তিনটি দেশের জনগণের মধ্যে কল্যাণকর সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের সম্পক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। আমরা আমাদের মহান নিকট প্রতিবেশী ভারত, বার্মা ও নেপালের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছি। অতীত থেকে মুখ ফিরিয়ে পাকিস্তানের সাথে নতুন সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টায়ও লিপ্ত রয়েছি।

অতীতের তিক্ততা দূর করার জন্য আমরা কোন প্রচেষ্টা থেকেই নিবৃত্ত হই নাই। ১৯৫ জন যুদ্ধ অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করে এই উপমহাদেশে শান্তি ও সহযোগিতার নতুন ইতিহাস রচনার কাজে আমরা আমাদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছি। এই ১৯৫ জন যুদ্ধ অপরাধীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে লিপ্ত থাকার অসংখ্য সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল, তবু সকল অপরাধ ভুলে গিয়ে আমরা ক্ষমার এমন উদাহরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছি, যা এই উপমহাদেশে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। উপমহাদেশের শান্তি, নিশ্চিত করার কাজে আমরা কোন পূর্বশর্ত দিই নাই কিংবা দর কষাকষি করি নাই। বরং জনগণের জন্য আমরা এক সুকুমার ভবিষ্যৎ প্রেরনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবান্বিত হয়েছি। অন্যান্য বড় বিরোধ নিষ্পত্তির কাজেও আমরা ন্যায় বিচার ও পারস্পরিক সমঝোতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। ৬৩ হাজার পাকিস্তানী পরিবারের দুর্গতি একটি জরুরী মানবিক সমস্যা হয়ে রয়েছে। পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের কথা তাঁরা আবার প্রকাশ করেছেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁদের নাম রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির কাছে তালিকাভুক্ত করেছেন। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও আইন অনুসারে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করার অধিকার তাঁদের রয়েছে। একই

সঙ্গে মানবতার তাগিদে তাঁদের সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। সাবেক পাকিস্তানের সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বাঁটোয়ারা আর একটি সমস্যা, যার আশু সমাধান দরকার। বাংলাদেশ আপোষ মীমাংসার জন্য প্রস্তুত। আমাদের প্রত্যাশা এই উপমহাদেশের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থে পাকিস্তান আমাদের আহবানে সাড়া দেবে এবং ন্যায় বিচার ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবে। তাহলে উপমহাদেশে পরিস্থিতির স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টা সফল হওয়ার পথে আর কোন বাধা থাকবে না। বাংলাদেশ তার সকল প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীসূলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। যে সম্পর্কের ভিত্তি হবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, পরস্পরের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং একে অন্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

বিশ্বের এ এলাকায় এবং অন্যত্রও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

জাতিসংঘ ও মানুষের অগ্রগতি

এই দুঃখ-দুর্দশা সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘ মানুষের ভবিষ্যৎ আশা-আকাংখার কেন্দ্রস্থল। নানা অসুবিধা ও বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও জাতিসংঘ তার জন্মের পর সিকি শতাব্দী কালেরও বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানব জাতির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এমন দেশের সংখ্যা খুব কম, যারা বাংলাদেশের মতো এই প্রতিষ্ঠানের বাস্তব সাফল্য ও সম্ভাবনা অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে। ডঃ কুর্ট ওয়াইল্ডহাইম এবং তাঁর যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীবৃন্দের প্রেরণাদানকারী নেতৃত্ব এই জাতিসংঘ আমাদের দেশে বিরাট ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ করেছে। বাংলাদেশের বুক থেকে যুদ্ধের ক্ষত দুর করা, যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী কোটি খানেক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এ কাজের লক্ষ্য। সেক্রেটারী জেনারেল, তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এই বিরাট দায়িত্ব পালনে সমন্বয় সাধনের প্রেরণা জুগিয়েছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উপমহাদেশে অবশিষ্ট যে মানবিক সমস্যা রয়েছে, তার সমাধানেও জাতিসংঘ এই রকমের গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসবে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সর্বনাশা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী আহরণের কাজে জাতিসংঘ যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার জন্যও আমরা কৃতজ্ঞ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে যে সব দেশ বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলায় এবং বিশ্ব সমাজের দ্রুত এগিয়ে আসার উপযোগী নিয়মিত প্রতিষ্ঠান

গঠনে বাংলাদেশের বিশেষ স্বার্থ নিহিত রয়েছে। অবশ্য সূচনা হিসাবে এই ধরণের একটি ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই হয়েছে। এই ব্যবস্থা জাতিসংঘের বিপর্যয় ত্রাণ সমন্বয়কারীর অফিস স্থাপন। সংস্থাটি যাতে কার্যকরভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে, সেজন্য তাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা একান্ত দরকার। জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশেরই এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

প্রিয় প্রেসিডেন্ট, সর্বশেষে আমি মানবের অসাধ্য সাধন ও দূরূহ বাধা অতিক্রমের অদম্য শক্তির প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থার কথা আবার ঘোষণা করতে চাই। আমাদের মতো দেশসমূহ, যাদের অভ্যুদয় সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে, এই আদর্শে বিশ্বাসই তাদের বাঁচিয়ে রাখবে। আমাদের কষ্ট স্বীকার করতে হতে পারে। কিন্তু আমাদের ধ্বংস নাই। এই জীবন যুদ্ধের মোকাবেলায় জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই শেষ কথা। আত্মনির্ভরশীলতাই আমাদের লক্ষ্য। জনগণের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগই আমাদের নির্ধারিত কর্মধারা। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অংশীদারিত্ব আমাদের কাজকে সহজতর করতে পারে, জনগণের দুঃখ কষ্ট লাঘব করতে পারে। কিন্তু আমাদের ন্যায় উদীয়মান দেশসমূহের অবশ্যই নিজেদের কার্যক্ষমতার প্রতি আস্থা রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে শুধু জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হতে পারি, গড়ে তুলতে পারি উন্নততর ভবিষ্যৎ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও সাফল্য

১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর দীর্ঘ দেড়যুগ ধরে স্বাধীনতা বিরোধী ও জাতিদ্রোহী শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিরবচ্ছিন্নভাবে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের সাড়ে তিনবছর শাসনামল সম্পর্কে জঘন্য মিথ্যাচার ও অপপ্রচার অব্যাহত রেখেছে। জনগণকে জানতে দেয়া হয়নি সম্পূর্ণ যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে শত-সহস্র জটিলতা, স্বাধীনতা বিরোধী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের ধ্বংসাত্মক, হিংসাশ্রয়ী, অন্তর্ঘাত ও নাশকতামূলক অপতৎপরতা এবং নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই সাড়ে তিনবছর রাষ্ট্র পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা। আজ প্রমাণিত, মাত্র সাড়ে তিন বছর শাসনামলে বঙ্গবন্ধু জাতির সার্বিক ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন বিগত ২০ বছরেও তা অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি।

১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারী মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে অনুমোদিত হয় বাংলাদেশের পতাকার নকশা, জাতীয় সঙ্গীত ' আমার সোনার বাংলা', রণসঙ্গীত 'চল চল চল উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল।' ডাক টিকেটের নকশা প্রণয়ন কমিটি গঠন, শহীদ মিনার পুনঃনির্মাণে অর্থ বরাদ্দ করেন। একই দিনে তিনি ১৩৭৮ সালের চৈত্র মাসের সকল খাজনা মওকুফ, অনতিবিলম্বে কৃষকদের মধ্যে আড়াই কোটি টাকা ঋণ সরবরাহ, ৬ মাসের মধ্যে সারাদেশে টেলিযোগাযোগ পুনঃস্থাপন, রাজশাহী চিনিকলে উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং ঢাকা-কুমিল্লা সরাসরি টেলিযোগাযোগ পুনঃস্থাপনের ঘোষণা দেন।

পুনর্গঠন ও অবকাঠামো নির্মাণ ঃ সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎপাদনের ব্যবস্থাসহ অর্থনৈতিক অবকাঠামো ধ্বংস হয়। দেশে দুষটি সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম ও মংলা সম্পূর্ণভাবে অকেজো করে যায় পাকিস্তানী পরাজিত শক্তি। বন্দর মুখে মাইন স্থাপন করা হয় এবং জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়। হার্ডিঞ্জ রেল সেতুসহ ২৯১ টি রেল সেতু, ২৭৪টি রোড সেতু যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৪০টি রেল লাইন ধ্বংস করে দেয়। ১০% রেল লাইন উপড়ানো ছিলো। ৬৬টি ফেরী, ৫০০০টি ট্রাক ও ২৫০০টি বাস ধ্বংস করা হয়। আরও ধ্বংস করা হয় লক্ষ লক্ষ বাড়ীঘর। একটি বিমানও ছিল না। ছিল না একটি সমুদ্রগামী জাহাজ। ছিলো না ব্যাংকে কোন বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ মওজুদ।

খাদ্য গুদাম ছিলো খালি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু অতি দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো পুনঃনির্মাণে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন সমগ্র বিশ্বের কাছে তা ছিলো অকল্পনীয়।

শিক্ষা ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের প্রায় প্রতিটি স্কুল-কলেজে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও রাজাকার, আল-বদর বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিল। পরাজয়ের পূর্বে তারা এগুলোকে ধ্বংস করে বা জ্বালিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা হয়। অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী চাকুরের মর্যাদা দেয়া হয়। ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন ও প্রায় অর্ধ লক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের টিফিনের ব্যবস্থা, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক, শিক্ষার উপকরণ বই, খাতা, পেন্সিল বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় উন্নীত করার লক্ষ্যে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন শুরু হয়। টেক্সস্ট বুক বোর্ড গঠন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গঠন করা হয়। ব্যাপকভাবে ছাত্রবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল ও স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। বাংলা একাডেমী পুনর্গঠন ও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রচলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিল্পকলা একাডেমী, সেন্সরশীপ ব্যতীত নাটক করার অধিকার এবং গণমাধ্যমকে জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। কলেজ, বিশ্ববিদালয়ের ছাত্রাবাসসমূহে ভর্তুকি মূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা চালু করা হয়। এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয় হতে শুরু করে প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত ছাত্রদের বিনামূল্যে শার্ট, প্যান্ট, কাগজ, বই, খাতা, কলম সরবরাহ করা হয়।

স্বাস্থ্য ঃ সকল নাগরিকের সুচিকিৎসার জন্য প্রতি থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়। ৩৬৫ টি থানায় ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপিত হয় এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, হাসপাতাল নির্মাণ ও অস্থায়ী স্বাস্থ্য কর্মীদের স্থায়ী চাকরি দেয়া হয়। পরিবার পরিকল্পনা কার্যকর করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। সন্তান দানে সক্ষম দম্পতিদের জন্য রেজিস্ট্রেশন স্কীম চালু করা হয়। এ লক্ষ্যে টাংগাইল, নোয়াখালী ও খুলনাতে পাইলট প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়। দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রোটিনযুক্ত খাবার বিতরণ করা হয় এবং মোট জনসংখ্যার ৪৫% জনকে রেশন পদ্ধতির নেট ওয়ার্কে আনা হয়। প্রত্যেক গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ করা হয়। নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করা এবং মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

কৃষি ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর গ্রাম পর্যায়ে ২২ লক্ষের বেশী কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করতে হয়। তাদের কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কৃষি বিষয়ক মৌল কাঠামো নির্মাণে সহায়তাদানের পাশাপাশি নামমাত্র মূল্যে এবং বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ, বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ সরবরাহ করা হয়।হ্রাসকৃত মূল্যে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফ্ট

পাম্প ও ২৯০০টি গভীর ও ৩০০০ অগভীর নলকূপ বসানো হয় স্ক্র৭৩ সনের মধ্যেই। '৭২ সনেই বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে অধিক ফলনের জন্য ধান বীজ বিতরণ করা হয় ১৬,১২৫ টন, পাট বীজ ৪৫৪ টন ও গম বীজ ১,০৩৭ টন। এছাড়াও পাকিস্তানী আমলের ঋণগ্রস্ত কৃষকদের উপর জারী করা ১০ লক্ষের উপর সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করে তাদের সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করে দেয়া হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে রহিত করা হয়। কৃষিপণ্য বিশেষ করে ধান, পাট, তামাক ও আখের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে 'প্রাইস সাপোর্ট' বা নূন্যতম মূল্য বেঁধে দেয়া হয়। গরীব কৃষকদের রেশনের ব্যবস্থা করা হয়। তাদের ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে ও সরকারী খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্টের পূর্বে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা ছিলো ৩৫ ভাগ। ঐ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাস জমি প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ১০০ বিঘা জমির সিলিং নির্ধারিত হয়। স্বাধীনতার সময় ৩০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি ছিলো। চাষি জমির এক-তৃতীয়াংশ ছিলো অনাবাদী। বঙ্গবন্ধুর সরকার অনাবাদী জমির আবাদ ও খাদ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার জন্য নানাভাবে কৃষকদের সাহায্য ও উৎসাহিত করেন। বঙ্গবন্ধু সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে এদেশের কৃষি ও কৃষকের সমস্যা সমাধানকল্পে অতি দ্রুত পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং গ্রামভিত্তিক কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার অধীনে তিন ধরনের সেচ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। (১) শক্তি চালিত পাম্প, (২) গভীর নলকূপ, (৩) অগভীর নলকূপ সেচ প্রকল্প। দেশে এই শক্তি চালিত পাম্প প্রকল্পের দ্রুত উন্নতি হয়। ১৯৬৮-৬৯ সনে যেখানে পাম্পের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার সেখানে ১৯৭৪-৭৫ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬ হাজারে। এর ফলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ১৯৭০ সনে ২৬ লক্ষ একর থেকে ১৯৭৫ সনে ৩৬ লক্ষ একরে উন্নীত হয়। স্বাভাবিকভাবেই খাদ্য উৎপাদন বেড়ে যায়। ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে রাসায়নিক সার ৭৪%, পোকার ঔষধ ৪০%, উন্নত বীজ ব্যবহার ২৫% বৃদ্ধি পায়। কৃষি গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত আরোপ করা হয়। বিশ্ব বাজারে রাসায়নিক সারের দাম বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও সে অনুসারে বাংলাদেশে সারের দাম বৃদ্ধি করা হয়নি। ১৯৭২ সালে ইউরিয়া, পটাশ, টি,এস,পি সারের দাম মণ প্রতি ছিল মাত্র ২০ টাকা, ১৫ টাকা, ১০ টাকা।

শিল্প ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী বাহিনী, অবাঙালি শিল্পপতি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা যুদ্ধে অনিবার্য পরাজয় বুঝতে পেরে শিল্পে নিয়োজিত চলতি মূলধন, মূল্যবান যন্ত্রাংশ এদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করে দেয়। একই সাথে স্থায়ী সম্পদ কলকারখানা মেশিনপত্র অকেজো কিংবা ধ্বংস করে রেখে যায়। তাছাড়া এইসব শিল্প কারখানায় অবাঙালিদের বেশী চাকুরী ছিলো। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সার্বিক অর্থেই সঙ্কটে পড়ে এই সব শিল্প কারখানা অচল হয়ে পড়ে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত অচল শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরকারের তত্ত্বাবধানে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। '৭৩ সনের তুলনায় চিনি, সূতা, বস্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদির উৎপাদনে যে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছিল ১৯৭৪-৭৫ সনে সেই প্রবণতা বজায় থাকে,

উৎপাদন বাড়ে ১২%। মিলে তৈরী সূতা ও বস্ত্র বৃদ্ধি হয় প্রথম ৯ মাসে ১১% এবং ৩%। এছাড়া কতিপয় দ্রব্যের উৎপাদন উৎসাহজনকভাবে বৃদ্ধি পায়, এর মধ্যে খাদ্যশস্য, নিউজপ্রিন্ট, চা, সাইকেল, বৈদ্যুতিক কেবলস্ ও তামার তার ইত্যাদি ছিল প্রধান।

দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি ঃ ১৯৭৪ সালে বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি তীব্র আকার ধারণ করে। যার প্রভাবে উন্নত বিশ্বসহ সকল দেশের দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০ সালের তুলনায় ১৯৭৫ সালে আর্জেন্টিনায় সকল ভোগ্য পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় ১১ গুণ, চিলিতে ২৬ গুণ, কোরিয়াতে তিনগুণ, বৃটেনে দ্বিগুণ। খাদ্যের দাম বৃদ্ধি পায় আর্জেন্টিনায় ১০ গুণ, চিলিতে ৩০গুণ, কোরিয়াতে তিনগুণ, বৃটেনে দ্বিগুণ। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্ববাজারে গমের দাম ১৯৭২ সালের তুলনায় চারশ গুণ বৃদ্ধি পায়। থাইল্যাণ্ড ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে চাউল বিক্রয় করতো প্রতি টন ১৩০ ডলার, তা ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬০০ ডলারে। স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত আমদানীকারক দেশ হিসাবে ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশেও ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়। ১৯৭৪ সালের জুন হতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি পায়, জানুয়ারীর পর থেকে মূল্য হ্রাস পায়। ঢাকায় ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে মোটা সিদ্ধ চাউলের প্রতি সেরের মূল্য ছিলো ৪ টাকা, অক্টোবরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭ টাকা। তবে ফেব্রুয়ারী, জুন মাসে এই মূল্য কমে সের প্রতি ৬ টাকায় নেমে আসে। ১৪ই আগস্ট '৭৫-এ এসে দাঁড়ায় ৩.৭৫ পয়সা। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত এই সময়ে ঢাকা শহরে চাউলসহ সকল প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম ক্রমেই হ্রাসের দিকে দেখা যায়।

বন্যা, আকাল, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যাংক ডাকাতি, ব্যাংক লুট, আওয়ামী লীগ নেতাদের হত্যা, অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টির অপচেষ্টার মধ্যেও বঙ্গবন্ধু এগিয়ে যাচ্ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে। ভাবতে অবাক লাগে যে, এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তিনি কাজগুলো গুছিয়ে এনেছিলেন। পুনর্গঠনের যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন তা জাপান, জার্মান, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্সের বেলায় ঘটেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঐসব দেশে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তবুও তারা ৫ বছরের মধ্যে কোন অতিরিক্ত দাবী-দাওয়া বরদাস্ত করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমেরিকা ৫ বছর পর্যন্ত কোন সরকারি কর্মচারীর বেতন বাড়ায়নি। রাশিয়া ও চীনের বিপ্লবের পর অনাহারে লাখ লাখ লোক মারা গেছে।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু সকল প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করে এগিয়ে গেছেন। মাত্র সাড়ে ৩ বছরে ১১ হাজার কোটি টাকার ধ্বংসস্তূপের পর আরো ১৩ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন স্তম্ভ দাঁড় করিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের আগস্টের মধ্যে তিনি বাংলাদেশকে জাতিসংঘ সদস্যপদ, কমনওয়েল্থ সদস্যপদ, ওআইসি সহ ১৪টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ, ২২১টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি, শিল্পোৎপাদন ও কৃষি উৎপাদনে ভারসাম্য এনে দিয়েছিলেন। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি দেখে বিশ্ব অবাক হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালের বোরো মৌসুমে ২২ লাখ ৪৯ হাজার টন চাল উৎপাদিত হয় যা ১৯৭৩-৭৪ সালের চেয়ে ২৯ হাজার টন বেশি। এর আগে উৎপাদন হয় ৩৪ লাখ টন খাদ্যশস্য। অর্থাৎ খাদ্যশস্যে ভেসে গিয়েছিল বাংলাদেশ বন্যার প্লাবনের মতই। বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ডিসেম্বরে ঘোষণা দেবেন দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর এসময়ই তার উপর পরিকল্পনা মোতাবেক চূড়ান্ত আঘাত হানা হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশকে গড়ার জন্য বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিনবছর সময় পেয়েছেন। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করেছেন দু'টি ভাগে। প্রথমতঃ পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন এবং দ্বিতীয়তঃ উন্নয়ন। এ সময়ের মধ্যে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ ও ভৈরব সেতুসহ ৫৬৭টি সেতু নির্মাণ ও মেরামত, ৭টি নতুন ফেরি, ১৮৫১টি রেল ওয়াগণ ও যাত্রীবাহী বগি, ৪৬০টি বাস, ৬০৫টি নৌযান ও ৩টি পুরানো বিমান বন্দর চালু করে অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া মাইন উদ্ধার ও সংস্কার করে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর চালু করা হয়। পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিট জাতীয়করণ ও উৎপাদনক্ষম করে লাখ লাখ শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রগতিশীল সংবিধান প্রণয়ন, মদ-জুয়া, হাউজি-ঘোড়দৌড়সহ সমস্ত ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ, ইসলামী ফাউণ্ডেশন গঠন ও মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা, পবিত্র হজ পালনে সরকারি অনুদান প্রদান, ওআইসি সংস্থার সদস্যপদ লাভ ছিল বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ভারত থেকে ফেরা ১ কোটি লোকের পুনর্বাসন ও দেশের অভ্যন্তরে ৩ কোটি ছিন্নমূল মানুষের জন্য খাদ্য সংস্থান, ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের ফেরত পাঠানো, মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ফিরিয়ে নেয়া, মুক্তিযুদ্ধে নিহত ৩০ লাখ শহীদ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের দায়িত্ব গ্রহণ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট ও নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন, প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ প্রণয়ন, ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ও সরকারি কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষা প্রচলন, ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনসহ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ পুনঃনির্মাণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা, প্রতি থানা ও ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ এবং অস্থায়ী স্বাস্থ্য কর্মীদের স্থায়ী চাকুরের মর্যাদাদান, জাতীয় সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীসহ প্রতিরক্ষা বাহিনীকে জাতীয় মর্যাদায় পুনর্গঠন, কুমিল্লায় দেশের প্রথম সামরিক একাডেমী স্থাপন, পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও বেসামরিক প্রশাসনের অবকাঠামো গড়ে তোলা, পাকিস্তানে আটক ৪ লাখ বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করা, কয়েক লাখ পাকিস্তানীকে ফেরত পাঠানো, বাঙালি জাতি ও ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় প্রথম ভাষণ দান, জাতিসংঘের সদস্যপদ ও দুই শতাধিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়, ভারতের সঙ্গে সীমান্ত চুক্তি এবং ফারাক্কার পানি বন্টন চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য ৪৪ হাজার কিউসেক পানির ব্যবস্থা - এসব কার্যক্রম ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের অনন্য সাফল্যের উদাহরণ।

শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব

জাতীয় সংসদের ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭৫ তারিখে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ

জনাব স্পীকার,

আজ (২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭৫ সাল) আমাদের শাসনতন্ত্রের কিছু অংশ সংশোধন করতে হল। আপনার মনে আছে যখন শাসনতন্ত্র পাস করা হয়, তখন আমি বলেছিলাম, এই হাউস-এর পক্ষ থেকে এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয় তবে এই সংবিধানেরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হবে।

জনাব স্পীকার,

আপনি জানেন যে, যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতি পরাধীন ছিল। দু'শ বছরের ইংরেজের শাসন, পঁচিশ বছরের পাকিস্তানী শাসন এবং শোষণ বাংলাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। পঁচিশ বছর পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করেছিলাম বাংলার মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। হাজার হাজার কর্মী, নেতা ও জনসাধারণ শুধু কারাবরণই করে নাই, তাদের অনেককে জীবন দান করতে হয়েছিল। শোষকগোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। আমরা বহুদিন চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তাদের আঘাত বারবার আমাদের উপর এসেছে। তারপর চরম আঘাত তারা হানে- যে আঘাতের বিনিময়ে আমাদেরও চরম আঘাত হানতে হয়। দুনিয়ার দিকে আজকে আপনারা চেয়ে দেখুন, নিশ্চয় আপনি বলবেন স্পীকার সাহেব, আমরা যে আওয়ামী লীগ পার্টি এত ত্যাগ স্বীকার করে সংগ্রাম করেছি কোনদিন আমরা আমাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হই নাই। ক্ষমতার লোভে আমরা রাজনীতি করলে আমিও প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। আর এই নেতৃবৃন্দ অনেক বার মন্ত্রী - অনেক পদ পেতে পারত। কিন্তু আমরা চেয়েছি একটি শোষণমুক্ত সমাজ, আমরা চেয়েছিলাম বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, আমরা চেয়েছিলাম এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য।

সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা ক্ষমতায় এসেছি, বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছি। আমি যখন কারাগারে বন্দী ছিলাম আমার সহকর্মীরা এবং লক্ষ লক্ষ লোক দেশত্যাগ করে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরাজিত করি আমরা দুশমন বাহিনীকে। আমি নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভারতবর্ষের জনসাধারণ ও সামরিক বাহিনীকে এবং তাঁর সরকারকে। তাঁরা আমাদের সাহায্য করেছিলেন। এক কোটি লোক দেশত্যাগ করে চলে যায়। কোটি কোটি ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়। তিরিশ লক্ষ লোক জীবন দিতে বাধ্য হয়। তবুও আমরা চেষ্টা করেছিলাম দেশে যারা রাজনীতি করতে চান, দেশকে ভালবাসতে চান নিশ্চয়ই তাঁরা কাজ করবেন এবং তাঁদের একটা কর্তব্য রয়েছে। কোন দেশে কোন যুগে বিপ্লবের পরে বা সশস্ত্র বিপ্লবে ক্ষমতা দখল করে কোনদিন এইভাবে অবাধ অধিকার এবং অন্যান্য দলকে সুযোগ-সুবিধা দেয় নাই। আমরা দিয়েছিলাম। তার প্রমাণ আমাদের শাসনতন্ত্র। আপনি জানেন স্পীকার সাহেব, কি দেখেছি আমরা। তিন বছর হলো স্বাধীনতা পেয়েছি।

আপনারা জানেন আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। যারা দেশত্যাগ করে গেল তারা দেশে ফিরে আসল। তাদের রিহেবিলিটেট করতে হবে। রাস্তাঘাট সব ধ্বংসপ্রাপ্ত। আমরা একটা সরকার নিয়েছিলাম। সাড়ে সাত কোটি মানুষের সরকার, যেখানে আমাদের কাগজের নোট ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। তাদের ব্যাক করার মত আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না, আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না; পাকিস্তানীরা সর্বস্ব এখান থেকে নিয়ে যায়। সেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কত কষ্টকর সে কথা যারা করেছে তারাই বুঝতে পারে — অন্যরা বুঝতে পারে না। এ সমস্ত বিপ্লবের পর দেখা গেছে অনেক দেশে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা গেছে , তারা আশ্রয়হীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে তাদের পুনর্বাসন করার জন্য। কতটুকু পেরেছি না পেরেছি জানি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি আমাদের কর্তব্য পালন করতে ত্রুটি করি নাই।

স্পীকার সাহেব,

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, আজ আপনার এই এসেম্বলী বা সংসদের চারজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের আগে হত্যা করা হয়েছে যাঁরা এই কন্সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর মেম্বার ছিলেন। হত্যা করা হয়েছে গাজী ফজলুর রহমানকে, হত্যা করা হয়েছে নূরুল হককে, হত্যা করা হয়েছে মোতাহের মাস্টারকে এমনকি যারা কোনদিন আমাদের দেশে আমরা শুনি নাই যে নামাজে, ঈদের নামাজে কোন লোক নামাজ পড়তে যায়, সেই নামাজের সময়ে তাকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। হাজার হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে যাঁরা স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে যাঁরা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের হত্যা করা হয়েছিল যাঁরা ২৫ বৎসর পর্যন্ত এই বাংলাদেশে পাকিস্তানী শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন, অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছেন। কোন একটি রাজনৈতিক দল যাদের আমরা অধিকার দিয়েছিলাম —

তারা কোনদিন এদের কনডেম করেছে কি - না? তারা কনডেম করে নাই। তাঁরা মুখে বলেছেন যে, তারা অধিকার চান। তাঁরা মিটিং করেছেন, সভা করেছেন—পার্টি করতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁরা কি করেছেন? আমাদের সংবিধানে অধিকার দেয়া আছে ভোটের মাধ্যমে তোমরা সরকার পরিবর্তন করতে পার — এই ক্ষমতা আমরা দিয়েছিলাম। বাই-ইলেকশন আমরা ৩ মাসের মধ্যে দিয়েছি। জনগণ ভোট না দিলে তার জন্য আমরা দায়ী নই। তখন তারা বলেছিল এই সরকারকে অস্ত্র দিয়ে উৎখাত করতে হবে। মুখে বলেছে তারা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, নাগরিক অধিকারে বিশ্বাস করি, কিন্তু গোপনে গোপনে তারা অস্ত্র যোগাড় করেছে এবং এইসব অস্ত্র দিয়ে যাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়েছি আমরা—যারা অস্ত্র দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের হত্যা করেছে ঘরের মধ্যে গিয়ে। আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেক দেশে নিয়ম আছে যদি আপনাকে অধিকার ভোগ করতে হয়, অন্যের অধিকারকেও রক্ষা করতে হয়, 'ইফ ইউ হ্যাভ এ লিবার্টি ইউ হ্যাভ রেস্‌পনসিবিলিটি' একথাটা ভুললে চলবে না। কিন্তু রেস্‌পনসিবিলিটি নেবে না আর সেখানে নিয়ে সরকারী কর্মচারীর মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করবে, জনগণের মধ্যে যেয়ে তারা অন্য কথা বলবে এবং তারপর তারা অস্ত্র যোগাড় করবে, রাতের অন্ধকারে মানুষকে হত্যা করবে, সশস্ত্র বিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করবে, প্রয়োজন হলে উৎখাত করে দেওয়া হবে। আমি যদি বলতাম যে, আপনারা বক্তৃতার মধ্যে বলেন, উৎখাত করতে হবে, আপনারা কবে প্রস্তুত হইয়া উৎখাত করবেন আর আমার যা শক্তি আছে সে শক্তি দিয়ে দুই মিনিটের মধ্যে আমি উৎখাত করতে পারি, আপনাদের কিন্তু তবু আমরা অধিকার দিয়েছি। আজকে আপনারা জানেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এটা একটা 'হট বেড অফ ইন্টারন্যাশনাল ক্লিক'। এখানে অর্থ আসে, এখানে মানুষকে পয়সা দেওয়া হয়। এখানে তারা বিদেশীদের দালাল হয়। আজকে একটা কথা এখানে আমাদের ভুললে চলবে না, যে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি, সেই রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা দরকার হলে রক্ষা করা হবে। স্বাধীনতা নস্যাৎ হতে দেওয়া হবে না। এবং তাদের মনে রাখা দরকার আমরা যারা দীর্ঘদিন, পঁচিশ বৎসর মাথানত না করে বাংলার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য এদেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এদেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারোর নাই। (হর্ষধ্বনি) অস্ত্র আইয়ুব খান নিয়ে এসেছিলেন , অস্ত্র ইয়াহিয়া খান নিয়ে এসেছিলেন, অস্ত্র ইস্কান্দার মির্জা নিয়ে এসেছিলেন, কোনদিন তাঁদের কাছে আমরা মাথানত করি নাই। আজ আমাদের সত্যি অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ। আমরা কি নিয়ে শুরু করেছিলাম! ভুললে চলবে কেন যে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটা দেশ। লোকসংখ্যা কত বেশী এখানে, চুয়ান্ন হাজার স্কোয়ার মাইল, পঁচিশ বৎসর সমস্ত পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না, এখানে রেলওয়ে লাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এখানে পোর্ট ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এখানে ব্যাংকে আমাদের গোল্ড রিজার্ভ নাই, এখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ নাই, এখানে কম্যুনিকেশন নাই, এখানে প্লেন নাই, এখানে গুদামে খাবার নাই — তাই নিয়ে আমাদের সরকার শুরু করতে হয়েছিল, কষ্ট মানুষের আছে, কষ্ট মানুষের অনেক দিন পর্যন্ত করতে হবে—যে পর্যন্ত দেশকে গঠন করা না যাবে। আজ আমরা নিশ্চয়ই

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো কিন্তু দুই তিন বৎসরে না হলেও আমরা ২,১৬৩ কোটি টাকা বিদেশ থেকে এনেছি , সমস্ত মিলে, ফুডে, নন-প্রজেক্ট এইড, প্রজেক্ট এইড মিলে দুনিয়ার বন্ধু রাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করেছে। তাঁরা দিয়েছেন আমাদের ২,১৬৩ কোটি টাকা। আমরা এ পর্যন্ত খরচ করেছি এদেশের মানুষের জন্য ১৪০০ কোটি টাকা। আর আমাদের যে আয় প্রায় ৯০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকা তাও আমরা ব্যয় করেছি। এই টাকা আমরা বাংলার মানুষের জন্য খরচ করেছি। যাতে মানুষের কিছু সাহায্য হয়। খাদ্য আমাদের কিনতে হয়। বাইরে থেকে। মানুষ না খেয়ে মারা যায়। আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম তারপর থেকে বাংলাদেশে আসল drought. তারপরে হলো দুনিয়াজোড়া ইনফ্লেশন। যে জিনিস কিনতাম এক টাকা দিয়ে সে জিনিস কিনতে হয় আমাদের দুই টাকা দিয়ে। যে জিনিস কিনতাম একশ' টাকা দিয়ে সে জিনিস কিনতে হয় দু'শ টাকা দিয়ে। আমাদের দেশের জিনিস যা বিদেশে বিক্রি করতাম তার ন্যায্যমূল্য আমরা পেলাম না। আমরা যারা অনুন্নত দেশ, এ কষ্ট আমাদের ভোগ করতেই হয়। কারণ, আমাদের শোষণ করেই তারা বড়লোক হয়। তাদের কাছ থেকে যখন আমাদের জিনিস আনতে হয় তখন অনেক পয়সা দিয়ে আনতে হয়। আর আমরা যখন বিক্রি করি তার দাম আমরা পাই না। এ অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশ চলেছে। তার পরেও আমাদের দেশ চালাতে হয়েছে। ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দুনিয়া ঘুরতে হয়েছে। খাবার দুনিয়া থেকে আনতে হয়েছে গ্রামে গ্রামে পৌঁছাতে হয়েছে। সমস্ত দুনিয়ায় যে ইনফ্লেশন হয়ে গেল, শুধু আমরা নয়, সমস্ত দুনিয়ার যারা অনুন্নত দেশ তাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আসলো এক ভয়াবহ বন্যা। যে বন্যা — এত বড় বন্যা আমার জীবনে আমি দেখেছি কি-না সন্দেহ। না ছিলো খাবার। পাঁচ হাজার সাতশ' লঙ্গরখানা খোলা হলো এবং সেখানে রিলিফ অপারেশন চালানো হল। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে নিজেদের যা কিছু ছিল তা-ই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাঁচাতে পারলাম না সকলকে। ২৭ হাজার লোক না খেয়ে মারা গেল। এখনও মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। গায়ে তাদের কাপড় নাই। আমি জীবনভর এদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছি ওদের পাশাপাশি রয়েছি। কারাগারে নির্যাতন ভোগ করেছি। আমার সহকর্মীরা জীবন দিয়েছে। কিন্তু ওদের দুঃখ দূর করার জন্য, মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য, আমি যে বলেছি একদিন মাননীয় স্পীকার সাহেব, এই হাউসে, আমরা শোষিতের গণতন্ত্র চাই। যারা রাতের অন্ধকারে পয়সা লুট করে, যারা বড় বড় অর্থশালী লোক, যারা বিদেশ থেকে ভোট কেনার জন্য পয়সা পায় তাদের গণতন্ত্র নয়—শোষিতের গণতন্ত্র। এটা আজকের কথা নয়, বহুদিনের কথা আমাদের এবং সে জন্যই আজকে আমাদের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করতে হয়েছে।

জনাব স্পীকার

আমরা আজকে আমাদের কঠিন কর্তব্য পালন করেছি। আমাদের দেশের মানুষ দুঃখী, না খেয়ে কষ্ট পায়। গায়ে কাপড় নাই। শিক্ষার আলো তারা পায় না, রাতে একটা হারিকেনও জ্বালাতে পারে না। নানা অসুবিধার মধ্যে তারা দিন কাটাচ্ছে।

জনাব স্পীকার,

আমরা আমাদের কতগুলো কর্তব্য পালন করেছি আজ। আজকে আমরা যারা শিক্ষিত , এমএ পাস করেছি , বিএ পাস করেছি স্পীকার সাহেব, আপনি জানেন এই দুঃখী বাংলার গ্রামের জনসাধারণ , তারাই অর্থ দিয়েছে আমাদের লেখা পড়া শেখার একটা অংশ। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন, পড়ে পাস করেছেন, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে পাস করেছি, আজ যারা লেখাপড়া শিখছেন , তাদের খরচের একটা অংশ দেয় কে? আমার বাপ-দাদা নয়, দেয় বাংলার দুঃখী জনগণ। কি আমি তাদের ফেরত দিয়েছি? তাদের আমি রিপে (Ripay) করেছি কতটুকু। তাদের প্রতি কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি এটা আজকে আমাদের সমালোচনার প্রয়োজন আছে। আজ যে একজন ডাক্তার হয়, একজনকে ডাক্তারী পাস করতে বাংলার দুঃখী মানুষ না হলেও এক লক্ষ টাকা ব্যয় করে। একটা ইঞ্জিনিয়ার করতে না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ পড়ে। একজন এগ্রিকালচার এক্সপার্ট করতে না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ পড়ে। একজন এদেশের দুঃখী মানুষ, যাদের পেটে খাবার নাই, তাদের অর্থেই এদের লেখাপড়া শেখানো হয়েছে। আজ সময় এসেছে আজকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে কি তাদের , কতটুকু বা ফেরত দিয়েছি , যার অর্থে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছো, যার অর্থে তুমি আজ গ্রেজুয়েট হয়েছো, যার অর্থে তুমি আজ ডাক্তার হয়েছো, যার অর্থে তুমি Scientist হয়েছো, যার অর্থে তুমি মানুষ হয়েছো, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে Professor হয়েছো, যারা লেখাপড়া শিখতেছো তাদের প্রত্যেকটা শিক্ষার জন্য একটি অংশ বাংলার দুঃখী জনগণ দেয়। সেটাই সরকারের টাকা এবং সেই টাকা ব্যয় করে। আজ আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। আমরা কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি। আমরা কতটুকু তাদের দিয়েছি। শুধু আমাদের দাও। কে দেবে? বাংলার দুঃখী জনগণকে তোমরা কি ফেরৎ দিয়েছো। এটা আজ প্রশ্ন। আজ আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। দেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে। না হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। আজ এদের কর্তব্য বুঝতে হবে। আমি আমার কি কর্তব্য পালন করেছি। দুঃখের বিষয় আজ শুধু আমরা বলি আমরা কি পেলাম। তোমরা কি পেয়েছো? তোমরা পেয়েছো শিক্ষার আলো, যে শিক্ষা দিয়েছে বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কি ফেরত দিয়েছো বাংলার দুঃখী মানুষকে , যে দুঃখী মানুষ না খেয়ে মরে যায়? যে মানুষের কাপড় নাই, যে মানুষ বস্ত্র খুঁজে পায় না, যার বস্ত্র নাই, বুকের হাঁড়গুলো পর্যন্ত দেখা যায়, তাকে আজকে তোমরা কি দিয়েছো? এ প্রশ্ন আজ এখন জেগে গেছে। আজকে বহুদিন পর্যন্ত বার বার বলেছি। আজকে করাপশনের কথা বলতে হয়। বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ। যারা আজকে ওদের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছি। আজ যেখানে যাবেন, করাপশন দেখবেন আমাদের রাস্তা খুঁড়তে যান করাপশন, খাদ্য কিনতে যান—করাপশন, জিনিস কিনতে যান—করাপশন, বিদেশ গেলে টাকার উপর করাপশন, তারা কারা? আমরা যে ৫ পারসেন্ট শিক্ষিত সমাজ, আমরা হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে করাপ্ট পিপল, আর আমরাই করি বক্তৃতা। আমরা লিখি খবরের কাগজে , আমরাই বড়াই করি। আজ

আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। এসব চলতে পারে না। মানুষকে একদিন মরতে হবে। কবরে যেতে হবে। কিছুই সে নিয়ে যাবে না। তবুও মানুষ ভুলে যায় — কি করে এ অন্যায় কাজ করতে পারে।

বহু দুঃখ নিয়ে এ কাজ করতে হয়েছে। বহুদিন পর্যন্ত বিবেকের দংশনে জ্বলেছি। মাথানত করি নাই কোন অন্যায়ের কাছে। আপোষ করি নাই কোন অন্যায়ের কাছে। জীবনভর সংগ্রাম করেছি। আর এই দুঃখী মানুষ যে রক্ত দিয়েছে, স্বাধীনতা এনেছে, তাদের রক্তে বিদেশ থেকে খাবার আনবো, সেই খাবার চুরি করে খাবে , অর্থ আনবো, সেই অর্থ চুরি করে খাবে, টাকা আনবো, তা বিদেশ চালান দিবে। বাংলার মাটি থেকে এদের উৎখাত করতে হবে।

স্পীকার সাহেব,

এই বক্তৃতা থেকেই আমি ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি। আজ আমাদের কি অবস্থা। আজ আমার পপুলেশান কন্‌ট্রোল করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়, ভিক্ষুকের জাতের কোন ইজ্জত আছে? দুনিয়ায় জীবনভর ভিক্ষা পাওয়া যায়? স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সেজন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। কাজ করবো না, ফাঁকি দিব, অফিসে যাবো না, ফাঁকি দিব। ফ্রী-স্টাইল। ফ্রী-স্টাইল মানে গণতন্ত্র নয়। অফিসে ১০ টার সময় যাওয়ার কথা বলে ১২টার আগে যাব না। পাঁচটায় ছুটি হলে ৩ টায় ফিরে আসতে হবে। কারখানায় কাজ করবো না। পয়সা দিতে হবে। আমার শ্রমিকরা খারাপ না। আমার শ্রমিকরা কাজ করতে চায়। আমার কৃষকরা আজ কাজ করতেছে। Food production এগিয়ে গেছে। আমরা ব্যাঘাত সৃষ্টি করি। আমরাই ষড়যন্ত্র করি। আমরাই ধোঁকা দিই। আমরাই লুট করে খাই। জমি দখল করে নিয়ে যাই। এ সকল কাজ করে কারা? আমরা এই দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সামজ, এদেশের তথাকথিত লেখাপড়া জানা মানুষ। যাদের পেটের মধ্যে দুই অক্ষর বুদ্ধি বাংলার ওইসব দুঃখী মানুষের পয়সায় এসেছে — তারা আজকে এ কথা ভুলে যায়। কথা হলো আমি কি পেলাম আর আমি কি দিলাম। আজ সেখানেই প্রশ্ন। আমি বার বার বলেছি—আজকে আমাদের আত্মসুদ্ধির প্রয়োজন, নচেৎ দেশকে ভালবাসা যায় না এবং দেশের উন্নতি করা যায় না। কলে-কারখানায়, ক্ষেত-খামারে আমাদের Production বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না। কি করে আপনি করবেন? যদি ধরেন ২০ লক্ষ টন খাবার বছরে deficit হয়। এই তিন বছর পর্যন্ত গড়ে এর চেয়ে অনেক বেশী মাল আনতে হয়েছে। প্রথম আনতে হয়েছে ত্রিশ লক্ষ টন। পাঁচশ' চল্লিশ লক্ষ মণ খাদ্য যদি ধরুন গড়ে প্রত্যেক বৎসর আনতে হয় বিদেশ থেকে, কোথায় পাওয়া যাবে, কে দেবে? জাহাজ ভাড়া কোথায়? বিশ থেকে ত্রিশ লক্ষ টন প্রতি বছর আমাদের আনতে হয়েছে বিদেশ থেকে এই তিন বছরে। বন্ধু রাষ্ট্ররা সাহায্য করেছে। গ্র্যান্ট দিয়েছে, লোন দিয়েছে, আনতেছি। খাবার দেবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কতকাল দেবে? কদ্দিন দেবে? মানুষ বাড়ছে। বছরে ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আজকে আমাদের পপুলেশান প্লানিং করতে হবে। পপুলেশন কন্ট্রোল করতে হবে। না হলে বিশ বৎসর পর ১৫

কোটি লোক হয়ে যাবে। পঁচিশ বছর পরে ? চুয়ান্ন হাজার স্কোয়ার মাইল, বাঁচতে পারবে না। যে-ই ক্ষমতায় থাকুন বাঁচার উপায় নাই। অতএব পপুলেশান কন্ট্রোল আমাদের করতেই হবে। সেজন্য ডেফিনিট স্টেপ আমাদের নিতেই হবে বাংলাদেশে। প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। না হলে মানুষ বাঁচতে পারবে না। প্রোডাকশন বাড়াবার জন্য শৃংখলাবদ্ধ হতে হবে। বিশৃংখল জাতি কোনদিন বড় হতে পারে না। উচ্ছৃংখল হয়ে গেছি আমরা। ফ্রী-স্টাইল । এটা হবে না , ওটা হবে না, আর যাকে এ্যারেস্ট করব, বলবে যে অমুক পার্টির লোক। ওকে এরেস্ট করলে বলবে অমুক পার্টির লোক। খবরের কাগজে বিবৃতি । জিনিসপত্রের দাম একদিন হঠাৎ ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা হয়ে গেল। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিল, হোল্ বাংলাদেশে ২০০ টাকা হয়ে গেল; যেখানে সমস্ত কিছুর অভাব সেখানে দুনিয়া থেকে সবকিছু কিনতে হয়। আমরা কলোনি ছিলাম। আমরা কোন জিনিসে সেলফ সাফিসিয়েন্ট না। আমরা ফুডে সেলফ সাফিসিয়েন্ট না, আমরা কাপড়ে সেলফ সাফিসিয়েন্ট না, আমরা তেলে সেলফ সাফিসিয়েন্ট না, আমরা খাবার জিনিসে সেলফ সাফিসিয়েন্ট না। আমাদের-ম্যাটিরিয়েলস কিনতে হবে, ঔষধে সেলফ সাফিসিয়েন্ট না। আমরা কলোনি ছিলাম পাকিস্তানীদের। আমাদের সবকিছু প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সবকিছু বিদেশ থেকে আনতে হবে, কোথায় পাবেন বৈদেশিক মুদ্রা আপনারা? ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে ঘুরতে হবে, ইনকাম করতে হবে। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। যে মানুষ ভিক্ষা করে তার যেমন ইজ্জত থাকে না, যে জাতি ভিক্ষা করে তারও ইজ্জত থাকে না। ভিক্ষুক জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেই জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃংখলা আনতে হবে এবং শৃংখলা দেশের মধ্যে আনতে হবে। আজকের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই, স্পীকার সাহেব। যারা জীবনভর সংগ্রাম করেছে, একথা যদি কেউ মনে করে যে, জনগণের ভোটের অধিকার আমরা কেড়ে নিয়ে গেছি — নো, আজ এখানে যে সিস্টেম করা হয়েছে তাতে পার্লামেন্ট-এর মেম্বারদের জনগণ দ্বারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। যে প্রেসিডেন্ট হবে তাকেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার আছে। তবে এইটুকু আমরা আজকে একটা কোর্টে বিচারে গেলে একটা যদি সিভিল মামলা হয় আপনি তো উকিল, স্পীকার সাহেব। আল্লাহর মর্জি যদি একটা মামলা সিভিল কোর্টে হয়, বিশ বৎসরেও সে মামলা শেষ হয় বলতে পারেন আমার কাছে? বাপ মরে যাবার সময় বাপ দিয়ে যায় ছেলের কাছে। আর উকিল দিয়ে যায় তার জামাইর কাছে সেই মামলা। আর ক্রিমিনাল কেস হলে এই লোয়ার কোর্ট, জজ কোর্ট—বিচার নাই! জাসটিস ডিলেড, জাসটিস ডিনাইড—উই হ্যাভ টু মেইড এ কমপ্লিট চেইঞ্জ এবং সিস্টেমের মধ্যে পরিবর্তন করতে হবে। মানুষ যাতে সহজে বিচার পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার পায়। ব্যাপক পরিবর্তন দরকার। কলোনিয়াল পাওয়ার এবং রুল নিয়ে দেশ চলতে পারে না। নতুন স্বাধীন দেশ স্বাধীন মতবাদ, স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে হবে। যেখানে জুডিশিয়াল সিস্টেম এর অনেক পরিবর্তন দরকার। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। কোন কথা শুনি না। কলে কারখানায় কাজ করতে হবে। কাজ করে প্রোডাকশন বাড়াও। নিশ্চয়ই তোমরা তার অধিকার পাবে। কাজ করবে না , পয়সা

নেবে, সে পয়সা হবে না। কার পয়সা নেবে? গরীবের উপর ট্যাক্স বসাবো? খাবার আছে তার, কাপড় আছে তার? তার ঘর থেকে ধন কোত্থেকে আনি? পারব না। তোমাদের কাজ করে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। ক্ষেত-খামারে কাজ না করলে তোমরা জমির উপর থাকতে পারবে না। আমার সেখানে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে।

জানি আমাদের অসুবিধা আছে। বন্যা আমাদের নিয়ন্ত্রণ হয় নাই। আমাদের বন্যা হয়ে যায় প্রত্যেক বৎসর, সাইক্লোন হয় প্রত্যেক বৎসর, ন্যাচারাল ক্যালামিটি হয়—সেটা বোঝা গেল। আজ আমাদের কথা কি—আজ শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজকের থেকে নয়। আপনি মেম্বার ছিলেন প্রথম দিন থেকে স্পীকার সাহেব। আপনি জানেন এই দল এই লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রাম করেছে। কারো কাছে কোনদিন আপোষ করে নাই, মাথা নত করে নাই। আজ দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, কালোবাজারী, নতুন পয়সাওয়ালা এদের কাছে আমার আত্মাবিক্রি করতে হবে, এদের অধিকারের নামে আমাদের এদেরকে ফ্রী-স্টাইলে ছেড়ে দিতে হবে? কক্ষনো না। কোন দেশ কোন যুগে তা দেয় নাই। দিতে পারে না। যারা আজকে আমার মাল বিদেশে চালান দেয়, চোরাকারবারী করে, যারা দুর্নীতি করে, এদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। মানুষকে যারা পয়সা দেয়, তোমার মাহিনা দেয় তোমার সংসার চালানোর জন্য ট্যাক্স দেয় তার কাছে তুমি আবার পয়সা খাও। মেন্টালিটি চেইঞ্জ করতে হবে। সরকারী কর্মচারী , মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট—আমরা জগণের সেবক, আমরা জনগণের মাস্টার নই। মেন্টালিটি আমাদের চেইঞ্জ করতে হবে। আর যাদের পয়সায় আমাদের সংসার চলে, যাদের পয়সায় আমাদের রাষ্ট্র চলে, যাদের পয়সায় আজ আমাদের এসেম্বলী চলে, যাদের পয়সায় আমরা গাড়ী চড়ি, যাদের পয়সায় আমরা পেট্রোল খরচ করি, আমরা কার্পেট ব্যবহার করি, তাদের জন্য কি করলাম? সেটাই আজ বড় জিনিস।

আমি সেদিন গিয়েছি কুমিল্লা পর্যন্ত। একটা মাত্র প্রশ্ন করেছি—তোমরা না খেয়ে মরছ, খাবার চাল নাই, গায়ে তোমাদের কাপড় নাই , তোমরা কেন আমাকে দেখতে এসেছ? তোমরা কেন আমাকে ভালবাস। আমি তা বুঝতে পারি। রাস্তার দু'পাশে হাজার হাজার লোক। আমি সহকর্মীদের কাছে বার বার বলেছিলাম যে, আমি আমার কাজ করেছি, তোমরা এবার আমাকে ছুটি দাও। বলেছি বহুদিন , পঁয়ত্রিশ বৎসর , আমি এদেশে ১৯৩৮ সালে, আমার যখন বাচ্চা বয়স তখন আমি জেলে গেছি। তারপর থেকে একদিনও আমি বিশ্রাম করি নাই, আমি রাজনীতি করেছি। অত্যাচার আমি যা সহ্য করেছি সে সব বাদ দেন। যারা, কত লোক মারা গেছে, আমার চেয়ে অনেক মানুষ বেশী ত্যাগ স্বীকার করেছে, দেশে আমি সংগ্রাম করেছি আমার সহকর্মীদের নিয়ে। কিন্তু একটা খেলা হয়ে গেছে। বাজার নিয়ে খেলে, দাম নিয়ে খেলে বেশী অসুবিধা হলে গোপনে গিয়ে নিউজ দেয়, এই নিউজটা একটু ছাপিয়ে দেন। আর অমনি গোলমাল লেগে গেল। ঐ যে বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলাম। ফ্রি-স্টাইল চলে না। সাড়ে সাত কোটি মানুষ — ৫৪ হাজার বর্গমাইলে। বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়, কাপড় আনতে হয়, কোন কিছু চলতে পারে না—এখানে Free style চলে না।

প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। ক্ষেত খামারে উৎপাদন করতে হবে। মানুষ হতে হবে। ছাত্র সমাজের লেখাপড়া করতে হবে। লেখাপড়া করে মানুষ হতে হবে। জনগণ টাকা দেয় ছাত্রগণকে মানুষ হবার জন্য সে মানুষ হতে হবে— আমরা যেন পশু না হই। লেখাপড়া শিখে আমরা যেন মানুষ হই। কি পার্থক্য আছে জানোয়ারের সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে? যে জানোয়ার একটি মানুষের বাচ্চাকে কামড়িয়ে ধরে খেয়ে ফেলে দেয়, আর একটি মানুষ বুদ্ধিবলে এখান থেকে পয়সা নিয়ে তাকে না খাইয়ে মারে? কি পার্থক্য আছে জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে? যদি মনুষ্যত্ব আমি হারিয়ে ফেলি তাহলে মানুষ কোথায়? প্রথমেই আমাকে মনুষ্যত্ব আনতে হবে, তবে আমি মানুষ হব। না হলে মানুষ আমাকে কেন বলা হয়। Because আমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। যখন মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলি তখন তো আমি মানুষ থাকি না। আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছি। আমি সকলের কাছে আবেদন করব, আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন করব, আজ যে শাসনতন্ত্র, আজকে আমার দুঃখ হয়, আজ আপনারা আমাকে এই কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট-এর সঙ্গে আমাকে প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন। আমার তো ক্ষমতা কম ছিল না। প্রাইম মিনিস্টার হিসাবে সমস্ত ক্ষমতা আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন। আমরা টু-থার্ড মেজরিটি; তবু আপনারা এমেণ্ডমেন্ট করে আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছেন। এই সীটে আমি আর বসব না। এটা কম দুঃখ আমার স্পীকার সাহেব, তবু আজকে আমূল পরিবর্তন করেছি শাসনতন্ত্রকে। কারণ সুষ্ঠু শাসন কায়েম করতে হবে। যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে। যেখানে অনাচার-অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারে। চেষ্টা নতুন, আজি আমি বলতে চাই—This is our second revolution —second revolution আমাদের। এই revolution -এর অথ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এর অর্থ অত্যাচার অবিচার, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। আমি চাই এই হাউস থেকে স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে দেশবাসী দলমত নির্বিশেষে সকলকে বলব, দেশকে ভালবাস, জাতির চারটি প্রিন্সিপলকে ভালবাস। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সেকুলারিজম। তোমরা আসো, কাজ করো, দরজা খোলা। সকলকে, যারা এই মতে বিশ্বাস করে তাদের প্রত্যেককে Constitution (কন্সটিটিউশন) করো, আসো কাজ করো। দেশকে রক্ষা করো। দেশকে বাঁচাও। মানুষকে বাঁচাও। মানুষের দুঃখ দূর কর। আর দুর্নীতিবাজ ঘুষখোর চোরাকারবারীদের উৎখাত করো। আর একটা দল— তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলাম আমরা । কোন দেশে করে নাই। স্পীকার সাহেব, আপনিও তো ছিলেন। কোন দেশের ইতহাসে নেই। পড়েন দুনিয়ার ইতিহাস। বিপ্লবের পরে বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে যারা, শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, যারা এদেশের মানুষকে হত্যা করেছে তাদের কোন দেশে কোন যুগে ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম। সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম। বলেছিলাম দেশকে ভালবাস, দেশের জন্য কাজ কর, স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নাও, থাকো। কিন্তু অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তারা এখনও গোপনে বিদেশীদের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারা মনে করে যে, খবর রাখি না। এতবড়— যারা আজকে একটা Bandit (বাণ্ডিট) মানুষকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে, সে মনে করেছে তাকে কেউ ধরতে পারবে না। তাকে যদি

ধরা যায়, আজ তার দলবল সবাইকে যদি ধরা যায়, ধরতে পারবো না কোন অফিসার ঘুষ খান? ধরতে পারবো না যদি অন্ধকারে যেয়ে বিদেশের পয়সা খান? ধরতে পারবো না কারা Hoarder (হোর্ডার) আছেন? ধরতে পারবো না কারা Black Marketing -এ (ব্লাক মার্কেটিং) আছেন। নিশ্চয়ই ধরতে পারব। সময়ের প্রয়োজন। যেতে পারবে না কেউ ইনশাল্লাহ, পাপ একদিন ধরা দিবেই , এটা মিথ্যে হতে পারে না। আর কোনদিন দুনিয়ার পাপ আর পূণ্য পাশাপাশি চলতে পারে না। পূণ্য চলে একদিকে আর পাপ চলে আরেকদিকে। Vice and virture can't mix together, We should not forget it. আমরা যাদের ক্ষমা করেছিলাম , তারা গ্রামে গ্রামে বসে আমাদেরকে দুঃখ দুর্দশার মধ্যে আজকে কটাক্ষ করে। বন্ধ করে দেওয়া হবে সব। তাদেরকে অধিকার দেওয়া হবে স্বাধীনতা নস্যাৎ করার জন্য? কোনো দেশে দেয় নাই, আমরা দিয়েছিলাম মাফ। মাফ যদি হজম করতে না পারা যায় তাহলে কেমন করে কঠোর হস্তে দমন করতে হয় তাও আমরা জানি। আজ আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হচ্ছে।

আজকে amended constitution -এ (এমেন্ডেড কনস্টিটিউশন) যে নতুন সিস্টেমে আমরা যাচ্ছি এটাও গণতন্ত্র। শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। আমাদের শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বাংলার মাটিতে কোনদিন আসতে পারবে না, আমরা allow (এলাউ) করব না । বাংলাদেশকে ভালবাসব না, বাংলার মাটিকে ভালবাসব না, বাংলা ভাষাকে ভালবাসব না, বাংলার কালচারকে ভালবাসব না, আর এখন পর্যন্ত বিকজ আমি ফ্রি-স্টাইল দিয়ে দিয়েছিলাম —যার যা ইচ্ছা তারা তা লেখে। কেউ এ নামে বাংলাদেশকে ডাকে, ও নামে বাংলাদেশকে ডাকে, বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে তারা লজ্জাবোধ করে, তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার। যেমন নাই চোরাকারবারী , ঘুষখোর, যেমন নাই দুর্নীতিবাজদের তেমন নাই ওই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী—যারা ভুলে যান, ভুলে যান বাংলার মাটি, বাংলার নাড়ী মানুষকে। স্পীকার সাহেব, ঐ রাত্রের বেলায় দু'জনকে মেরে বিপ্লব করা যায় না। এ আওয়ামী লীগ— বোধ হয় এরকম দশ বিশ বছর আগে আরম্ভ করতে পারতাম। দশটাকে মারলাম, পাঁচটাকে মারলাম, তাতে বিপ্লব হয় না। এটা ডাকাতি হয়। ওটা খুনই হয়। ওটা মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করা হয়। বাগেরহাটের একটা জায়গাতে, চার ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাইকে রাত্রে এসে গুলী করে মেরেছে। এটা কি একটা পলিটিক্যাল ফিলোসফি? এ ফিলোসফি দুনিয়ার পচাগান্ধা ডাস্টবিনের মধ্যে নিক্ষেপ হয়ে গেছে। এ ফিলোসফিতে কোনদিন দেশের মধ্যে মুক্তি আসতে পারে না। এবং কোনদিন তা সাক্সেসফুল হতে পারে নাই, হতে পারে না। এটা শেষ। আন্দোলনের মধ্যেই আমার জন্ম। আমি তো আন্দোলনের মধ্যেই মানুষ। আন্দোলন আমি জানি। কিন্তু আজ কি দেখতে পাচ্ছি। ফ্রি-স্টাইল! ওরা কিন্তু (এনজয়িং দ্যা ফুল লিবার্টি)— যারা যা ইচ্ছা। বিদেশীরা আসেন এখানে, গোপনে দু'বোতল মদ খাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্রিফ করে দেয়া হয়। ওরা মনে করেন, খবর রাখি না। আমরা খবর রাখি। বাংলাদেশের নিশ্চয়ই আজ তিন বছরের মধ্যে আমরা বলতে পারবো আমরা কিছু করেছি।

আপনাদের কি গভর্নমেন্ট ছিল? কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট ছিল? ছিল আপনাদের ফরেন অফিস? ছিল আপনাদের ডিফেন্স অফিস? ছিল আপনাদের প্লানিং? ছিল আপনাদের ন্যাশনাল ফিনান্স? ছিল আপনাদের কাস্টম? ছিল আপনাদের কি ? কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম আমরা? ইউ হ্যাভ নাউ অরগানাইজড এ ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট এন্ড এফেকটিভ ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট, ইনশাল্লাহ। বেটার দ্যান মেনি কানট্রিজ। আই ক্যান চ্যালেঞ্জ। বিদেশ থেকে খাবার আনতে আমাদের বহু সময় লেগে যায়। অনেক এফিসিয়েন্ট গভর্নমেন্ট দেখেছি। কিন্তু আমরা যেখানে কম্যুনিকেশন নাই। যেখানে কিছুই নাই, সেখানে আমরা দেখতে পেরেছি পনেরো দিনের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচ হাজার সাতশো লঙ্গরখানা খুলে মানুষকে বাঁচাবার মত এফিসিয়েন্সি এ দেশের গভর্নমেন্টের আমরা দেখেছি। হয় না কি? নিশ্চয়ই হয়েছে। কোনদিন কেউ স্মাগলিং বন্ধ করতে পেরেছে। আমরা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট স্মাগলিং বন্ধ করতে পেরেছি। এই গর্ব আমাদের আছে। আমরা অর্থনীতির কাঠামো সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি। এডমিনিস্ট্রেশন সেট-আপ করেছি। আজ আমরা আর্মি, নেভী, এয়ার ফোর্স. রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর আমরা সমস্ত অরগানাইজড করেছি। কি নিয়ে আমরা আরম্ভ করেছিলাম? আজ আপনি বসে আছেন স্পীকার সাহেব, এ এসেম্বলীর মধ্যে কি ছিল আমাদের ? বলেন কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। আজকে এই অবস্থার মধ্যে দেশকে চলতে দেওয়া যায় না। আমাদের পরিবর্তন দরকার। কিন্তু শুধু পরিবর্তন করেই দেশের মুক্তি আসে না। যদি মানুষের মেন্টাল পরিবর্তন না হয়। এবং সে জন্যে আজকে শুধু আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি, যারা জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের ভোটের মাধ্যমে এসেছি, আমাদের কর্তব্য সঙ্গে সঙ্গে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, দলমত নির্বিশেষে বাংলার জনগণ যে যেখানে আছেন আজকে থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি স্পীকার সাহেব যে আমরা নতুন জীবন শুরু করব, আমরা নতুন বিপ্লব শুরু করব। কেন করতে পারব না? পারি নাই ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত। আমরা ঘরে বসে তিন চারজনকে নিয়ে সমস্ত বাংলার মানুষের মুভমেন্ট আমরা চালাই নাই? একটা চুরি হয় নাই, একটা ডাকাতি হয় নাই, ভল্যানটিয়াররা কাজ করেছে। নতুন জীবন সৃষ্টি করতে হবে। উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে মোবিলাইজ করতে হবে। মানুষ ভাল। বাংলার মানুষের মত মানুষ কোথাও নাই। বাংলার গরীব, বালার কৃষক ভাল, বাংলার শ্রমিক ভাল। যদি খারাপ হয়, তবে আমরা তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ। যত গোলমালের মূলে এই তারাই । যত অঘটনের মূলে তারাই। কারণ তারাই হলেন ভোকাল শ্রেণী। তারা বক্তৃতা করেন, তারা কাগজে লেখেন। তারা এখানে করেন, ওখানে করেন। তারা আছেন বেশ, এ অবস্থায় দেশ চলতে পারে না। সে জন্যেই শাসনতন্ত্র আমাদের পরিবর্তন (এমেন্ড) করতে হয়েছে। এখন আমাদের সামনে কাজ কি? এক - দেশকে স্বয়ংসম্পুর্ণ করতে হবে। এবং পপুলেশন কন্ট্রোল আমাদের করতে হবে। আপনাদের দুর্নীতি ,ঘুষ, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের কি করতে হবে? আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বাঙালী জাতি যে প্রাণ, যে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিল সে প্রাণ, সেই অনুপ্রেরণার মতবাদ নিয়ে অগ্রসর হতে

হবে, দেশের দুঃখী মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে, তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে। স্পীকার সাহেব, এ জন্যে আজ আপনার মাধ্যমে যারা যেখানে আছেন, যারা দেশকে ভালবাসেন , সকলকে আমি আহ্বান করব ঃ আসুন, দেশ গড়ি। আসুন, দেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটাই। আসুন, আমরা দেশের মানুষের দুঃখ দূর করিয়া তা না করতে পারলে ইতিহাস আমাদের মুখে কলঙ্ক লেপন করবে। স্পীকার সাহেব , বড় দুঃখ, এই হাউসের আমি লিডার ছিলাম পার্টির আমি লিডার তখন আমি এখানে এই সিটে বসতাম। আমার সহকর্মীরা আজ আমাকে— আমার মেম্বারশীপ কেড়ে নিয়ে গেছেন, আমি মেম্বার থাকতে পারলাম না। আমাকে তারা প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছে এবং আজকে নতুন সিস্টেমে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। সিস্টেম পরিবর্তন করেই আমরা সাকসেসফুল হতে পারব না। যদি আপনারা চেষ্টা না করেন এবং আপনারা যদি নিঃস্বার্থভাবে—যেভাবে স্বাধীনতার সংগ্রাম আপনারা না করেন, অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে গঠনমুলক কাজে, দেশ গড়ার কাজে, উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে, তাহলে খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি এ অনুরোধ করব,ঃ চলুন, আমরা অগ্রসর হই। বিস্‌মিল্লা করে আল্লার নামে অগ্রসর হই। ইন্‌শাল্লাহ আমরা কামিয়াব হবো। খোদা আমাদের সহায় আছেন। এত বড় দুর্ধর্ষ, এত বড় শক্তিশালী, এত বড় বন্দুক, এত কামান, এত মেশিনগান, এত পাকিস্তানী সৈন্য, এত বড় তথাকথিত শক্তিশালী আইয়ুব খান, এহিয়া খান, ইসকান্দার মীর্জা , চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বাংলার মানুষকে অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছে বন্দুক দিয়ে, তার বিরুদ্ধে বিনা অস্ত্রে আপনাদের নিয়ে সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত যদি উৎখাত করতে পারি, তাহলে কিছু দুর্নীতিবাজ কিছু ঘুষখোর , কিছু শোষক, কিছু ব্ল্যাক মার্কেটার্স বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে পারব না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। যদি সকলে মিলে আপনারা নতুন প্রাণ, নতুন মন নিয়ে খোদাকে হাজির নাজের করে নিজের আত্মসমালোচনা করে, আত্ম-সংশোধন করে, আত্মশুদ্ধি করে যদি ইন্‌শাল্লাহ কাজে অগ্রসর হন, বাংলার জনগণকে আপনারা যা বলবেন তারা তাই করবে। আপনাদের অগ্রসর হতে হবে। ইনশাল্লাহ আমি কামিয়াব হব। আর আপনাদের সকলকে আমি মোবারকবাদ জানাই। আমার পার্টি আছে এবং আপনারা পার্টির সদস্য। বহু দুঃখের দিন আপনাদের নিয়ে চালিয়েছি। সুখের মুখ আমরা দেখি নাই। এ ক্ষমতায় যে আমরা আছি, এই ক্ষমতা সুখ নয়। এ বড় কষ্ট, বড় কন্টকাকীণ এই ক্ষমতা, তবু আমাদের আজ কাজ করতে হবে।

স্পীকার সাহেব, আমি সকলকে ধন্যবাদ দিই। আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিই, স্টাফকে ধন্যবাদ দিই, যারা কর্মচারী তাদের ধন্যবাদ দিই, সহকর্মীদের ধন্যবাদ দিই, সকলকে ধন্যবাদ দিই, আমি আপনাদের একজন এবং একজন হিসেবে থাকব। আমি আপনাদের পাশে থাকব। আপনাদের মধ্যে থাকবো। এবং আপনাদের নিয়ে কাজ করব। বিশেষতঃ আমাদের সেই গভর্নমেন্ট থাকবে, মন্ত্রী থাকবে, কাজ-কর্ম করবে, কোন অসুবিধা হবার কারণ নেই। তবে কথা হলো এই যে, সবচেয়ে বড় কাজ আমাদের We have to work sincerely and honestly for the emancipation of the poor people of the country আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

বাংলাদেশ এসেছে বাংলাদেশ থাকবে

২৬শে মার্চ, ১৯৭৫ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ

আমার ভাই ও বোনেরা,

আজ ২৬শে মার্চ। ২৫ মার্চ রাত্রে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষকে আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিল। সেদিন রাতে বিডিআরের ক্যাম্পে, পুলিশ ক্যাম্পে আমার বাড়িতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চারিদিকে আক্রমণ চালায় ও নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশবিক শক্তি নিয়ে। বাংলার মানুষকে আমি ডাক দিয়েছিলাম, ৭ই মার্চ আমি তাদের প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। যখন দেখলাম আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে সেই মুহূর্তে আবার আমি ডাক দিয়েছিলাম যে আর নয়, মোকাবিলা কর বাংলার মানুষ যে যেখানে আছ, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা কর। বাংলার মাটি থেকে শত্রুকে উৎখাত করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীন করতে হবে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

দুনিয়ার মানুষের কাছে আমি সাহায্য চেয়েছিলাম। আমার সামরিক বাহিনীতে যারা বাঙ্গালী ছিল, আমার বিডিআর আমার পুলিশ, আমার ছাত্র-যুবক ও কৃষকদের আমি আহবান করেছিলাম। বাংলার মানুষ রক্ত দিয়ে মোকাবিলা করেছিল। ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত হারিয়েছিল। শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছিল। দুনিয়ার জঘন্যতম ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তানী শোষক শ্রেণী। দুনিয়ার ইতিহাসে এত রক্ত স্বাধীনতার জন্য কোন দেশ নাই, যা বাংলার মানুষ দিয়েছে। শুধু তাই নয়। তারা এমনভাবে পঙ্কিলতা করল, যা কিছু ছিল ধ্বংস করতে আরম্ভ করেছিল। ভারতে আমার এক কোটি লোক আশ্রয় নিয়েছিল। তার জন্য আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। আমি তাদের স্মরণ করি, খোদার কাছে মাগফেরাত কামনা করি, যারা এ দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে, আত্মাহুতি দিয়েছে। আমি তাদের কথা স্মরণ করব যে সকল মুক্তি বাহিনীর ছেলে যেসব মা-বোনেরা আমার যে কর্মী বাহিনী যারা আত্মাহুতি দিয়েছিল শহীদ হয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে এদেশ তাদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। আজ আমি স্মরণ করি ভারতীয় সেনাবাহিনীর যারা জীবন দিয়েছিল বাংলার মাটিতে। তাদের কথাও আমি স্মরণ করি।

একটা কথা। আপনাদের মনে আছে, যাবার পূর্বে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে ১৬ই ডিসেম্বরের আগে, কারফিউ দিয়ে ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায় আমার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করব, সম্পদ ধ্বংস করব বাঙ্গালী স্বাধীনতা পেলেও এই স্বাধীনতা রাখতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা হয়েছে। বাংলার লোক আজ জাতিসংঘের সদস্য; বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য, কমনওয়েলথের সদস্য, ইসলামী সামিট এর সদস্য। বাংলাদেশ দুনিয়াতে এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে, কেউ একে ধ্বংস করতে পারবে না।

ভাইয়েরা, বোনেরা আমার,

আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু একটা ওয়াদা আমরা রাখতে পারি নাই। জীবনে যে ওয়াদা আমি করেছি জীবন দিয়ে হলেও সে ওয়াদা আমি পালন করেছি। আমরা সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। আমরা জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করি; আমরা কো-এক্‌জিস্টেনসে (Co-existence) বিশ্বাস করি, আমরা বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা ভেবেছিলাম, পাকিস্তানীরা নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে, আমার সম্পদ ফেরত দেবে। আমি ওয়াদা করেছিলাম তাদের বিচার করব। এই ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাপ করেছি তাদের আমি বিচার করিনি। আমি ছেড়ে দিয়েছি এই জন্য যে এশিয়ায়; দুনিয়ায় আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানীরা আমার সম্পদ এক পয়সাও দিল না, আমার বৈদেশিক মুদ্রার কোন অংশ আমাকে দিল না। আমার গোল্ড রিজার্ভের কোন অংশ আমাকে দিল না। একখানা জাহাজও আমাকে দিল না। একখানা প্লেনও আমাকে দিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ এক পয়সাও দিল না এবং যাবার বেলায় পোর্ট ধ্বংস করলো, রাস্তা ধ্বংস করলো, রেলওয়ে ধ্বংস করলো, জাহাজ ডুবিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত কারেন্সী নোট জ্বালিয়ে বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানীরা মনে করেছিল যে, বাংলাদেশকে যদি অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের মানুষকে আমরা দেখাতে পারবো যে, তোমরা কি করেছো।

ভুট্টো সাহেব বক্তৃতা করেন। আমি তাঁকে সম্বর্ধনা দিয়েছিলাম লাহোরে আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল বলে। ভুট্টো সাহেব বলেন, বাংলাদেশের অবস্থা কি? ভুট্টো সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করি, ফ্রন্টিয়ারের পাঠানদের অবস্থা কি? ভুট্টো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, বেলুচিস্তানের মানুষের অবস্থা কি? এরোপ্লেন দিয়ে গুলি করে মানুষ হত্যা করছেন। সিন্ধুর মানুষের অবস্থা কি? ঘর সামলান বন্ধু ঘর সামলান। নিজের কথা চিন্তা করুন, পরের জন্য চিন্তা করবেন না। পরের সম্পদ লুট করে খেয়ে বড় বড় কথা বলা যায়। আমার সম্পদ ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না।

তোমরা আমায় কি করেছ! আমি সবার বন্ধুত্ব কামনা করি। পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নাই। কিন্তু আমার সম্পদ তাকে দিতে হবে। আমি দুনিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই, কারো সঙ্গে দুশমনি করতে চাই না। সকলের সাথে বন্ধুত্ব করে আমরা শান্তি চাই। আমার মানুষ দুঃখী, আমার মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়। আমি যখন বাংলাদেশ সরকার পেলাম, যখন জেল থেকে বের হয়ে আসলাম, তখন আমি শুধু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষই পেলাম। ব্যাঙ্কে আমাদের

বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না। শুধু কাগজ নিয়ে আমরা সাড়ে সাত কোটি লোকের সরকার শুরু করলাম। আমাদের গুদামে খাবার ছিল না। কিন্তু আল্লাহর রহমতে গত তিন চার বৎসরে না হলেও বিদেশ থেকে ২২ কোটি মণ খাবার বাংলাদেশে আনতে হয়েছে। বাইশ'শ কোটি টাকার মত বিদেশ থেকে হেল্প আমরা পেয়েছি। সেজন্য যারা আমাদের সাহায্য করেছেন সে সমস্ত বন্ধু রাষ্ট্রকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আর একটি কথা। অনেকে প্রশ্ন করেন আমরা কি করেছি? আমরা যখন ক্ষমতায় আসলাম, দেশের ভার নিলাম তখন দেশের রাস্তাঘাট যে অবস্থায় পেলাম তাকে রিপেয়ার করার চেষ্টা করলাম। সেনাবাহিনী নাই, প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে, পুলিশ বাহিনীর রাজারবাগ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই খারাপ অবস্থা থেকে ভাল করতে কি করি নাই? আমরা জাতীয় সরকার গঠন করলাম। আমাদের এখানে জাতীয় সরকার ছিল না, আমাদের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ছিল না। বৈদেশিক ডিপার্টমেন্ট ছিল না, প্লানিং ডিপার্টমেন্ট ছিল না। এখানে কিছুই ছিল না। তার মধ্যে আমাদের জাতীয় সরকার গঠন করতে হলো। যারা শুধু কথা বলেন তারা বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করে বলুন, আমরা কি করেছি! এক কোটি লোককে ঘর-বাড়ী দিয়েছি। রাষ্ট্রের লোককে খাওয়ানোর জন্য বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়েছে। পোর্টগুলোকে অচল থেকে সচল করতে হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে ২২ কোটি মণ খাবার এনে বাংলার গ্রামে গ্রামে দিয়ে বাংলার মানুষকে বাঁচাতে হয়েছে। তাই আজ কথা আছে। আমি মানুষকে বললাম, আমার ভাইদের বললাম, মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের বললাম, তোমাদের অস্ত্র জমা দাও। তারা অস্ত্র জমা দিল। কিন্তু একদল লোক- আমার জানা আছে- যাদের পাকিস্তান অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল তারা অস্ত্র জমা দেয়নি। তারা এ সব অস্ত্র নিয়ে নিরপরাধ লোককে হত্যা করতে আরম্ভ করল। এমনকি পাঁচজন পার্লামেন্টের সদস্যকেও তারা হত্যা করল। তবুও আমি শাসনতন্ত্র দিয়ে নির্বাচন দিলাম। কিন্তু যদি বাংলার জনগণ নির্বাচনে আমাকেই ভোট দেয় সে জন্য দোষ আমার নয়। ৩১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩০৭ সিট বাংলার মানুষ আমাকে দিলেন। কিন্তু একদল লোক বলে, কেন জনগণ আমাকে ক্ষমতা দিল? কোন দিন কোন দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে কেউ কাউকে এভাবে অধিকার দেয় না। কিন্তু অধিকার ভোগ করতে হলে তার জন্য যে রেস্পন্সিবিলিটি আছে সেটা তারা ভুলে গেলেন। আমি বললাম তোমরা অপজিশন সৃষ্টি করো, সৃষ্টি করলো। বক্তৃতা করতে আরম্ভ করলো। অন্ধকারে মানুষ হত্যা করতে আরম্ভ করলো। দরকার হলে অস্ত্র দিয়ে আমাদের মোকাবিলা করতে চায়। অস্ত্রের হুমকি দেওয়া হলো, মানুষ হত্যা থেকে আরম্ভ করে রেল লাইন ধ্বংস করে, ফারটিলাইজার ফ্যাক্টরী ধ্বংস করে, জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে, এমন সৃষ্টি করলো যাতে বিদেশী এজেন্ট যারা দেশের মধ্যে আছে তারা সুযোগ পেয়ে গেল। আমাদের কর্তব্য মানুষকে বাঁচানো চারিদিকে হাহাকার, স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের দাম আস্তে আস্তে বেড়ে গেল। সমস্ত জিনিস দুনিয়া থেকে আমাদের কিনতে হয়। খাবার কিনতে হয়। কাপড় কিনতে হয়। ঔষধ কিনতে হয়, তেল কিনতে হয়। আমরাতো কলোনী ছিলাম, দুইশ বছর ইংরেজদের কলোনী ছিলাম, পঁচিশ বছর পাকিস্তানের কলোনী ছিলাম। আমাদেরতো সব কিছুই বিদেশ

থেকে কিনতে হয়। কিন্তু তার পরেও বাংলার জনগণ কষ্ট স্বীকার করে কাজ করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তারা এগুবার দেয় না কাজ করতে দেয় না।

আর একদল বিদেশে সুযোগ পেল, তারা বিদেশ থেকে অর্থ এনে বাংলার মাটিতে বিশৃংঙ্খলার সৃষ্টি করলো। স্বাধীনতা নস্যাৎ করার চেষ্টা করলো। আজ এদিনে কেন বলছি এ কথা। অনেক বলেছি? এত বলার দরকার ছিল না । কিন্তু আমার চোখের সামনে মানুষের মুখ ভাসে। আমার দেশের মানুষের রক্ত আমার চোখের সামনে ভাসে। আমারই মানুষের আত্মা আমার চোখের সামনে সে সমস্ত শহীদ ভাইরা ভাসে যারা ফুলের মত ঝরে গেল শহীদ হলো। তাদের আত্মার কাছে রোজ কিয়ামতে কি জবাব দিব? আমরা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করলাম, তোমরা স্বাধীনতা নস্যাৎ করছো, তোমরা রক্ষা করতে পার নাই।

কেন সিষ্টেম পরিবর্তন করলাম? সিষ্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। সিষ্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য। কথা হলো এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে অফিসে যেয়ে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যায়, সাইন করিয়ে নেয়, ফ্রি ষ্টাইল। ফ্যাক্টরীতে যেয়ে কাজ না করে টাকা দাবী করে। সাইন করিয়ে নেয়। যেন দেশে সরকার নাই। শ্লোগান হলো বঙ্গবন্ধু কঠোর হও।

বঙ্গবন্ধু কঠোর হবে। কঠোর ছিল, কঠোর আছে। কিন্তু দেখলাম, চেষ্টা করলাম। এত রক্ত, এত ব্যথা এত দুঃখ দেখি কি হয় পারি কিনা। আবদার করলাম, আবেদন করলাম, অনুরোধ করলাম, রিকোয়েস্ট করলাম, কামনা করলাম, কথা শুনে না। চোরা নাহি শুনে ধর্মের কাহিনী।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার

আজকে যে সিষ্টেম করেছি তার আগেও ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর কম ছিল না। আমি বিশ্বাস করি না ক্ষমতা বন্দুকের নলে। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বাংলার জনগনের কাছে । জনগণ যে দিন বলবে বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দাও। বঙ্গবন্ধু , একদিনও রাষ্ট্রপতি, একদিনও প্রধানমন্ত্রী থাকবে না। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে নাই। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে দুঃখী মানুষকে ভালবেসে। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে শোষণহীণ সমাজ কায়েম করার জন্য।

দুঃখের বিষয়, তারা রাতের অন্ধকারে পাঁচজন পার্লামেন্টের সদস্যকে হত্যা করেছে, তিন চার হাজারের মত কর্মীকে হত্যা করেছে। আরেক দল দুর্নীতিবাজ টাকা পয়সা করে পাগল হয়ে গেছে। তবে যেখানে খালি দুর্নীতি ছিল গত দুই মাসের মধ্যে সেখানে, ইন্শাআল্লাহ কিছুটা অবস্থা ইম্প্রুভ করেছে। দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য আজকে কিছু করা হয়েছে। হ্যাঃ প্রেসিডেন্সিয়াল ফরম অব গবর্ণমেন্ট করেছি। জনগণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন। পার্লামেন্ট থাকবে। পার্লামেন্টের নির্বাচনে একজন, দুইজন, তিনজনকে নমিনিশন দেওয়া হবে। জনগণ বাছবে কে ভাল কে মন্দ । আমরা চাই শোষিতের গনতন্ত্র, আমরা চাই না শোষকের গনতন্ত্র। এটা পরিষ্কার ।

আমি প্রোগ্রাম দিয়েছি। আজকে আমাদের সামনে কাজ কি? আজকে আমাদের সামনে অনেক কাজ আমি সকলকে অনুরোধ করব। আপনারা মনে কিছু করবেন না, আমার কিছু উচিত কথা কইতে হবে। কারণ আমি কোনদিন ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। সত্য বলার অভ্যাস আমার আছে। মিথ্যা বলার অভ্যাস আমার নাই । কিন্তু কিছুটা অপ্রিয় কথা বলব। বন্যা হলো। মানুষ না খেয়ে কষ্ট পেল, হাজার হাজার লোক না খেয়ে মরে গেল। দুনিয়া থেকে ভিক্ষা করে আনলাম। ৫,৭০০ (পাঁচ হাজার সাতশ) লঙ্গরখানা খুললাম মানুষকে বাঁচাবার জন্য। সাহায্য নিয়েছি মানুষকে বাঁচাবার জন্য। আমি চেয়েছিলাম স্বাধীনতা। কি স্বাধীনতা? আপনাদের মনে আছে, আমার কথার মধ্যে দুইটা কথা ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায় যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে। যদি দুঃখী মানুষ পেট ভরে খেতে না পারে, কাপড় পরতে না পারে, বেকার সমস্যা দূর না হয়, তাহলে মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসতে পারে না। আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ? যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ । যে ব্ল্যাক মার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ । যারা কর্তব্য পালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে তারাও দুর্নীতিবাজ এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। আমি কেন ডাক দিয়েছি? এই ঘুণে ধরা ইংরেজ আমলের পাকিস্তানী আমলের যে শাসন ব্যবস্থা তা চলতে পারে না একে নতুন করে ঢেলে সেজে গড়তে হবে। তাহলে দেশের মঙ্গল আসতে পারে, না হলে আসতে পারে না। আমি তিন বছর দেখেছি। দেখে শুনে আমি আমার স্থির বিশ্বাসে পৌঁছেছি। জনগণকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে শাসনতন্ত্রের মর্ম কথা।

আমি জানি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। আমি জানি না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। আমার চেয়ে অধিক কে জানতে পারে? বাংলার কোন্ থানায় আমি ঘুরি নাই, বাংলার কোন্ জায়গায় আমি যাই নাই , বাংলার মানুষকে আমার চেয়ে কে ভাল করে জানে।

আপনারা দুঃখ পান, না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন, আপনাদের গায়ে কাপড় নাই, আপনাদের শিক্ষা দিতে পারছি না। কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিষ খাদ্য।

দুর্নীতিবাজদের খতম করুন

একটা কথা বলি আপনাদের কাছে, সরকারি আইন করে কোন দিন দুর্নীতিবাজদের দমন করা সম্ভব নয় জনগণের সমর্থন ছাড়া। আজকে আমার একমাত্র অনুরোধ আপনাদের কাছে, সেটা হল এই আমি বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়, জেহাদ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে। আজকে আমি বলব বাংলার জনগণকে এক নম্বর কাজ করতে হবে দুনীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। আমি আপনাদের সাহায্য চাই। কেমন করে করতে হবে? আইন চালাবো। ক্ষমা করব না। যাকে পাব ছাড়ব না, একটা কাজ আপনাদের করতে হবে। গণআন্দোলন করতে হবে। আমি গ্রামে গ্রামে নামবো। এমন আন্দোলন করতে হবে, যে ঘুষখোর যে দুর্নীতিবাজ,

যে মুনাফাখোর, যে আমার জিনিস বিদেশে চোরাচালান দেয় তাদের সামাজিক 'বয়কট করতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে। গ্রামে গ্রামে মিটিং করে দেখতে হবে। কোথায় ঐ চোর, ঐ ব্লাক মার্কেটিয়ার, ঐ ঘুষখোর। ভয় নাই, ভয় নাই, আমি আছি। ইনশাআল্লাহ, আপনাদের উপর অত্যাচার করতে দিব না। কিন্তু আপনাদের গ্রামে গ্রামে আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলন করতে পারে কে! ছাত্র ভাইয়েরা পারে, পারে কে? যুবক ভাইয়েরা পারে, পারে কে? বুদ্ধিজীবীরা পারে, পারে কে? জনগণ পারে, আপনারা সঙ্গবদ্ধ হন ঘরে ঘরে আপনাদের দুর্গ গড়তে হবে। সে দুর্গ গড়তে হবে দুর্নীতিবাজদের খতম করার জন্য। বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচন করার জন্য। এই দুর্নীতিবাজদের যদি খতম করতে পারেন তা হলে বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ দুঃখ চলে যাবে। এত চোরের চোর, এ চোর কোথা থেকে পয়দা হয়েছে তা জানিনা। পাকিস্তান সব নিয়ে গিয়েছে কিন্তু এই চোর রেখে গিয়েছে। এই চোর তারা নিয়ে গেলে বাঁচতাম। কিছু দালাল গিয়েছে, চোর গেলে বেঁচে যেতাম।

জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করুন

দ্বিতীয় কথা, আপনারা জানেন- আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ বেশী ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে ডবল ফসল করতে পারব না, দ্বিগুণ করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি তা হলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। ভিক্ষা করতে হবে না।

ভাইয়েরা আমার বোনেরা আমার,

ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত নাই। একটা লোককে আপনারা ভিক্ষা দেন এক টাকা কি আট আনা। তারপর তার দিকে কিভাবে চান, বলেন, ও বেটা ভিক্ষুক, যা বেটা নিয়ে যা আট আনা পয়সা। একটা জাতি যখন ভিক্ষুক হয়, মানুষের কাছে হাত পাতে, আমারে খাবার দাও, আমারে টাকা দাও, সে জাতির ইজ্জত থাকতে পারে না। আমি সেই ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না।

আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইদের কাছে যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্ট কাপড় পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই- জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ঐ শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইন্‌শাআল্লাহ হবে না ভিক্ষুকের মত হাত পাততে হবে না।

আমি পাগল হয়ে যাই চিন্তা করে। এ বছর '৭৫ সালে আমাকে ছয় কোটি মণ খাবার আনতে হবে। কি করে মানুষকে বাঁচাবো? কি করে অন্যান্য জিনিস কিনবো? অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্র সাহায্য দিচ্ছে বলে বেঁচে যাচ্ছি। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। আমাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসেবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

ভাইয়েরা আমার,

একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হলো ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ বাড়ে তাহলে ২৫-৩০ বছরে বাংলায় কোন জমি থাকবে না চাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সেই জন্য আজকে আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্লানিং করতে হবে। এটা হলো ৩ নম্বর কাজ। এক নম্বর হলো-দুর্নীতিবাজ খতম কর, দুই নম্বর হলো কলকারখানায়, ক্ষেতে খামারে প্রোডাক্শন বাড়ান, তিন নম্বর হলো পপুলেশন প্লানিং, চার নম্বর হলো-জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা বাংলাকে ভালবাসে, এর আদর্শ বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মেনে সৎপথে চলে, তারা সকলেই এই দলের সদস্য হতে পারবেন। যারা বিদেশী এজেন্ট, যারা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেয়, এতে তাদের স্থান নাই। সরকারি কর্মচারীরাও এই দলের সদস্য হতে পারবে। কারণ তারাও এই জাতির একটা অংশ। তাদেরও অধিকার থাকবে এই দলের সদস্য হওয়ার। এই জন্য সকলে যে যেখানে আছি একতাবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে লাগতে হবে।

জাতীয় দলের ব্রাঞ্চ

ভাইয়েরা, বোনেরা আমার,

এই জাতীয় দলের আপাততঃ ৫টা ব্রাঞ্চ হবে। একটা শ্রমিক ভাইদের অঙ্গদল, কৃষক ভাইদের একটা, যুবক ভাইদের একটা, ছাত্রদের একটা এবং মহিলাদের একটা। এই ৫টা অঙ্গদল মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। আমাকে অনেকে বলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ হলে আমাদের কি হবে। আমি বলি আওয়ামী মানে তো জনগণ। ছাত্র, যুবক, শিক্ষিত সমাজ, সরকারি কর্মচারী সকলে মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ।

শিক্ষিত সমাজকে আমি অনুরোধ করব আমরা কতজন শতকরা শিক্ষিত লোক? আমরা শতকরা ২০ জন শিক্ষিত লোক। তার মধ্যে সত্যিকার অর্থে আমরা শতকরা পাঁচজন শিক্ষিত। শিক্ষিতদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আমি যে এই দুর্নীতির কথা বললাম, আমার কৃষক দুর্নীতিবাজ? না আমার শ্রমিক? না। তাহলে ঘুষ খায় কারা? ব্লাক মার্কেটিং করে কারা? বিদেশী এজেন্ট হয় কারা? বিদেশে টাকা চালান দেয় কারা? হোর্ড করে কারা? এই আমরা, যারা শতকরা ৫ জন শিক্ষিত। এই আমাদের মধ্যেই ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ। আমাদের চরিত্রের সংশোধন করতে হবে আত্মশুদ্ধি করতে হবে। দুর্নীতিবাজ এই শতকরা ৫ জনের মধ্যে এর বাইরে নয়। শিক্ষিত সমাজকে একটা কথা বলব, আপনাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই। একজন কৃষক যখন আসে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে আমরা বলব, এই বেটা কোত্থেকে আইছিস বাইরে বয়, বাইরে বয়। একজন শ্রমিক যদি আসে, বলি এখানে দাঁড়া। এই রিকশাওয়ালা, ঐভাবে চলিস না।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলো। তুচ্ছ কর। এর পরিবর্তন করতে হবে। আপনি চাকরি করেন, আপনার মাইনা দেয় ঐ গরীব কৃষক। আপনার মাইনা দেয় ঐ গরীব শ্রমিক। আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়। আমরা গাড়ি চড়ি ঐ টাকায়। ওদের সম্মান করে কথা বলুন, ইজ্জত করে কথা বলুন। ওরাই মালিক, ওদের দ্বারাই আপনার সংসার চলে। সরকারি কর্মচারীদের বলি, মনে রেখ এটা স্বাধীন দেশ। এটা বৃটিশের কলোনী নয়। পাকিস্তানের কলোনী নয়। যে লোককে দেখবে তার চেহারাটা তোমার বাবার মত, তোমার ভায়ের মত, ওরই পরিশ্রমের পয়সা, ওরাই সম্মান বেশী পাবে। কারণ ওরা নিজে কামাই করে খায়। একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি কিছু মনে করবেন না, আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছে কে? আমার বাপ-মা, আমরা বলি বাপ-মা। লেখা পড়া শিখিয়েছে কে? ডাক্তারি পাস করায় কে? ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করায় কে? বৈজ্ঞানিক করে কে? অফিসার করে কে? কার টাকায়?

বাংলার দুঃখী জনগণের টাকায়। একজন ডাক্তার হতে সোয়া লাখ টাকার মত খরচ পড়ে। একজন ইঞ্জিনিয়ার করতে এক লাখ থেকে সোয়া লাখ টাকার মত খরচ পড়ে। বাংলার জনগণ গরীব। কিন্তু এরাই ইঞ্জিনিয়ার বানাতে টাকা দেয়, মেডিক্যালের টাকা দেয় একটা অংশ। আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, শিক্ষিত ভাইয়েরা, যে আপনার লেখা পড়ার খরচ দিয়েছে তা শুধু আপনার সংসার দেখার জন্য নয়। আপনার ছেলেমেয়েদের দেখার জন্য নয়। দিয়েছে তাদের জন্য আপনি কাজ করবেন, তাদের সেবা করবেন বলে, তাদের আপনি কি দিয়েছেন? কি ফেরত দিয়েছেন, কতটুকু দিচ্ছেন? তার টাকার ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, তার টাকার ডাক্তার সাহেব, তার টাকার মেম্বার সাহেব, তার টাকার সব সাহেব। আপনি দিচ্ছেন কি? কি ফেরৎ দিচ্ছেন? আত্মসমালোচনা করেন, বক্তৃতা করে লাভ নাই, রাতের অন্ধকারে খবরের কাগজের কাগজ ব্ল্যাক মার্কেটিং করে সকাল বেলা বড় বড় কথা লেখার দাম নেই। রাতের বেলা ওষুধ ব্ল্যাক মার্কেটিং করে বড় কথা বলার দাম নেই। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মদ খেয়ে অনেষ্টির কথা বলার দাম নাই। আত্মসমালোচনা করুন, আত্মশুদ্ধি করুন, তা হলেই হবেন মানুষ। এই যে কি হয়েছে সমাজের; সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই। যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে। কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিষ্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না, আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব তা নয়। পাঁচ বৎসরের প্ল্যান-এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ এ জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অংশ যে বেকার প্রত্যেকটি মানুষ যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে এই কো-অপরেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেষ্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল

টাউটদেরকে বিদায় দেওয়া হবে, তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে পাঁচ বৎসরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারী কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে। অংশ যাবে গবর্ণমেন্টের হাতে; দ্বিতীয়, থানায় থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। এই কাউন্সিলে সরকারি রাজনৈতিক কর্মী, কর্মচারী যেই হয় একজন তার চেয়ারম্যান হবেন। এই থানা কাউন্সিলে থাকবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সরকারি কর্মচারী। তার মধ্যে আমাদের কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি থাকবে, যুবক প্রতিনিধি থাকবে, কৃষক প্রতিনিধি থাকবে, তারাই থানাকে চালাবে। আর জেলা থাকবে না, সমস্ত মহকুমা জেলা হয়ে যাবে, মহকুমায় একটি করে এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল হবে। তার চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারিরা এক সঙ্গে তার মধ্যে থাকবে। সেখানে তারা সরকার চালাবেন। এইভাবে আমি একটা সিষ্টেম চিন্তা করেছি এবং করব বলে ইন্‌শাআল্লাহ আমি ঠিক করেছি। আমি আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চাই।

ভাই ও বোনেরা আমার,

আজকে একটা কথা বলি। আমি জানি, শ্রমিক ভাইয়েরা, আপনাদের কষ্ট আছে। এত কষ্ট, আমি জানি। তা আমি ভুলতে পারছি না। বিশেষ করে ফিক্সড ইনকাম গ্রুপের কষ্টের সীমা নাই, কিন্তু কোথায় থেকে হবে? টাকা ছাপিয়ে বাড়িয়ে দিলেই তো দেশের মুক্তি হবেনা। ইনফ্লেশন হবে। প্রোডাকশান বাড়াতে পারলে তার পরেই আপনাদের উন্নতি হবে, না হলে উন্নতি হবেনা। আমি জানি। যেমন আমরা আজকে দেখছি। কপাল। আমাদের কপাল। আমরা গরীব দেশতো আমাদের কপাল- আমার পাটের দাম নাই, আমার চায়ের দাম নাই। আমরা বেচতে গেলে অল্প পয়সায় আমাদের বিক্রি করতে হয়। আর আমি যখন কিনে আনি যারা বড় বড় দেশ তারা তাদের জিনিসের দাম অনেক বাড়িয়ে দেয়। আমরা বাঁচতে পারি না। মেহেরবাণী করে যুদ্ধের মনোভাব বন্ধ করো। আরমামেন্ট রেস বন্ধ করো। তোমরা অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করো। ওই সম্পদ দুনিয়ার দুঃখী মানুষকে বাঁচবার জন্য ব্যয় করো। তাহলে দুনিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে। আজকে তোমরা মনে করেছ আমরা গরীব-

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছে অপমান,
অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।"

তোমরা মনে করেছ আমরা গরীব, যে দামেই হোক আমাকে বিক্রি করতে হয়। এইদিন থাকবে না আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে। আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেষ্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভষ্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাআল্লাহ, এদিন থাকবে না। তোমরা আজকে সুযোগ পেয়ে জাহাজের ভাড়া বাড়িয়ে দাও। জিনিসের দাম বাড়িয়ে দাও। আর তাই আমাদের কিনতে হয়। আমরা

এখানে না খেয়ে মরি, আমাদের ইনফ্লেশন হয়, আমরা বাঁচতে পারি না। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাই, তোমরা কিছু খয়রাত দিয়ে একটু মিষ্টি হাসো। হাসো। হাসো হাসো। দুঃখে পড়েছি বিক্রিত হয়েছি। তোমাদের কাছে হাত পাততে হবে, হাসো। অনেকে হেসেছে। যুগ যুগ ধরে হেসেছে। হাসো। আরব ভাইয়েরাও গরীব ছিল। আরব ভাইদের সঙ্গে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করছি। প্যালেষ্টাইনের আরব ভাইদের ন্যায্য দাবি সমর্থন করে বাংলার মানুষ। আরব ভাইদের পিছনে তারা থাকবে প্যালেস্টাইন উদ্ধার করার জন্য। এও আমাদের পলিসি। যেখানে নির্যাতিত দুঃখী মানুষ সেখানে আমরা থাকব। শ্রমিক ভাইরা, আমি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান করছি। আপনাদের প্রতিনিধি ইন্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট, লেবার ডিপার্টমেন্ট শ্রমিক প্রতিনিধি বসে একটা প্লান করতে হবে। সেই প্ল্যান অনুযায়ী কি করে আমরা বাঁচতে পারি তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

ছাত্র ভাইরা লেখা পড়ার কাজ শিখেন। আমি খুশী হয়েছি যে আপনারা নকল টকল বন্ধ করেছেন একটু। কিন্তু একটা কথা আমি বলব, আমি পেপারে দেখেছি যে এবারে প্রায় এক পার্সেন্ট পাস, দুই পার্সেন্ট পাস, তিন পার্সেন্ট পাস। শিক্ষক সম্প্রদায়ের কাছে আমার আকুল আবেদন, ফেল করাবেন না। নকল বন্ধ করেছি। আপনাদের একটা কর্তব্য আছে। বলতে পারেন দুই পার্সেন্ট পাস করিয়ে আপনাদের কর্তব্য পালন করলেন। আপনাদের কর্তব্য আছে, ছেলেদের মানুষ করতে হবে। ফেল করানোতে আপনাদের তেমন বাহাদুরী নাই, পাস করালেই বাহাদুরী আছে। আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। আমিত শিক্ষকদের বেতন দিব। আমরা সব আদায় করবো, আপনারা লেখা-পড়া শিখান, আপনারা তাদের মানুষ করুন। শৃংখলা ফিরিয়ে আনুন, রাজনীতি একটু কম করুন। তাদের একটু মানুষ করার চেষ্টা করুন। একটু সংখ্যা বাড়ান- শুধু ১%, ২%, ৫% দিয়ে বাহাদুরী দেখিয়ে বললেন, খুব ষ্ট্রিক্ট হয়েছি। আমি ষ্টিক্ট চাই, নকল করতে দিবেন না। তবে আপনাদের কাছে আবেদন, মেহেরবানী করে আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। ছেলেদের মানুষ করার চেষ্টা করুন। পাশের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করুন। ওদের মানুষ হিসাবে তৈরি করুন। সেটাই ভাল হবে। রাগ করবেন না, আপনারা আবার আমার উপর রাগ করবেন। আমি বুদ্ধিজীবীদের কিছু বলি না। তাদের শুধু সম্মান করি। শুধু এইটুকুই বলি যে বুদ্ধিটা জনগণের খেদমতে ব্যয় করুন। এর বেশি কিছু বলি না। বাবা বলে কি মরে যাব! আবার কে বই লিখে ফেলবে। খালি সমালোচনা করলে লাভ হবে না।

আমার যুব ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টটা একটু হাফ প্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গী পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে যেয়ে এই কো-অপারেটিভকে সফল করার জন্য কাজ করতে হবে।

কৃষক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই। আর একটি কথা বলতে চাই, বিচার। বিচার। বাংলাদেশের বিচার। ইংরেজ আমলের বিচার। আল্লার মর্জি যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে, সেই মামলা শেষ হতে লাগে ২০ বছর। আমি যদি উকিল হই আমার জামাইকে উকিল বানিয়ে কেস দিয়ে যাই। ঐ মামলা ফয়সালা হয় না। আর যদি ক্রিমিনাল কেস হয়, চার বছর, তিন বছরের আগে শেষ হয় না।

এই বিচার বিভাগকে নতুন করে এমন করতে হবে যে থানায় ট্রাইবুনাল করার চেষ্টা করছি এবং সেখানে মানুষ এক বছর দেড় বছরের মধ্যে বিচার পাবে তার বন্দোবস্ত করছি। আশা করি সেটা হবে। তাই আমি এ কথা জানতে চাই, আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই একটি কথা। এই যে চারটি প্রোগ্রাম দিলাম, এই যে আমি কো-অপারেটিভ করব, থানা কাউন্সিল করব, সাবডিভিশনাল কাউন্সিল করব, আর আমি যে আপনাদের কাছ থেকে ডবল ফসল চেয়েছি জমিতে যে ফসল হয় তার ডবল, কলে কারখানার কাজ-সরকারী কর্মচারী ভাইরা একটু ডিসিপ্লিনে আসুন। অফিসে যান, কাজ করেন। আপনাদের কষ্ট আছে আমি জানি। দুঃখী মানুষ আপনারা। আপনারা কাজ করেন। তাদের পেটে খাবার নাই। তাদের উপর ট্যাক্স বসিয়ে আমি আপনাদের পুষতে পারব না; প্রডাকশন বাড়ালে আপনাদেরও এদের সঙ্গে উন্নতি হবে। এই যে কথাগুলো আমি বললাম, আপনারা আমাকে সমর্থন করেন কিনা, আমার উপর আপনাদের আস্থা আছে কিনা, আমাকে দুই হাত তুলে দেখিয়ে দিন।

ভাইরা, আবার দেখা হবে, কি বলেন ইন্‌শাআল্লাহ আবার দেখা হবে। আপনারা বহুদুর থেকে কষ্ট করে এসেছেন। গ্রামে গ্রামে ফিরে যান। যেয়ে বলেন, দুর্নীতিবাজদের খতম করতে হবে। ক্ষেতে খামারে, কলে কারখানায় প্রডাকশন বাড়াতে হবে। সরকারি কর্মচারী ভাইরা আপনারাও কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য হবেন। আপনারা প্রাণ দিয়ে কাজ করেন। ইন্‌শাআল্লাহ বাংলাদেশ এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে।

আপনারা শ্লোগান দিন আমার সাথে।

জয় বাংলা

বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।